
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
অনিলিখা
ও
অনিলিখা

অনিলিখা ও অনিলিখা

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

অনিলিখা
ও
অনিলিখা



পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৯

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ রঞ্জন দত্ত
অলংকরণ অগ্নিভ সেন

ONILIKHA O ONILIKHA
Science Fiction *by* Abhijnan Roychowdhury
Published by PATRA BHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/Patra-Bharati-521504074559888

ISBN 978-81-8374-554-3

আমার লেখার সবথেকে
বড় সমালোচক আমার স্ত্রী
শাশ্বতী রায়চৌধুরীকে

পত্রভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

রহস্যের দশ আঙুল
সব লজিকের বাইরে
ক রহস্য
ভৌতিক অলৌকিক
মাঝে মাত্র চব্বিশ দিন
সংকেত রহস্য
গ্লোবাল ওয়ার্মিং
রহস্য যখন ডারউইন

অনিলিখাকে নিয়ে প্রথম কল্পবিজ্ঞান নির্ভর উপন্যাস 'সংকেত রহস্য'। ২০০৮ সালে শারদীয়া কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। বই হিসেবে প্রকাশিত হয় ২০১০ সালে। তারপর থেকেই প্রতি বছর অনিলিখাকে নিয়ে কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার উপন্যাস লিখে এসেছি। প্রত্যেকবারেই এই উপন্যাসগুলো নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে আরও লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এবারে এ বইতে আছে দুটো উপন্যাস—'অনিলিখা ও হিরোসি' এবং 'অনিলিখা ও সেই লোকটা'।

প্রথমে অনিলিখা ও হিরোসি-র কথায় আসি। সেদিন ছিল ৬ই আগস্ট, ১৯৪৫। হঠাৎ করে এই দিনটা আট বছরের আসাহির থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়েছিল। হারিয়েছিল বাবা, মা ও বোনকে। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। আসাহি কিন্তু সেই দিনটা ভুলতে পারেনি। বহু বছর পরে আসাহির হাতেই তৈরি হয়েছে একটা আট বছরের বাচ্চার মতো দেখতে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান শান্ত রোবট। সে ফুল ভালোবাসে, তারা দেখতে ভালোবাসে, গল্প শুনতে ভালোবাসে—সব দিক দিয়েই সে ঠিক একটা বাচ্চা ছেলের মতো। কিন্তু তার মধ্যে কি এক অন্যমানুষ লুকিয়ে আছে? তার নির্মল হাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে কি কোনো হিংস্রতা? গা ছমছম রোমহর্ষক ঘটনাপ্রবাহে এবার অনিলিখা মৃত্যুর মুখোমুখি। সব কাণ্ড এবার সুইজারল্যান্ডে।

এবারে আসি 'অনিলিখা ও সেই লোকটা'-র কাহিনি সূত্রে। কাহিনির এক প্রান্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লেখা এক হারিয়ে যাওয়া চিঠি। জীবন-মৃত্যুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা এক সৈনিকের চিঠি তার পরিবারের উদ্দেশ্যে। সে চিঠি এসে পৌঁছোয় অনিলিখার হাতে। যার উদ্দেশ্যে লেখা, তার সন্ধানে অনিলিখা যায় ইংল্যান্ডে। কিন্তু সে চিঠি যার জন্য লেখা তিনি কি এখনও জীবিত? নাকি তিনি মৃত্যুর পরেও এক অচেনা জগতে সেই চিঠির অপেক্ষায় আছেন—যাকে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না?

কাহিনির অন্য এক প্রান্তে এক বছর আটেকের ছেলে যার বাবা মারা গেছে। হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে তার মা ও বোন। তার নিঃসঙ্গ জীবন জুড়ে শুধুই পাখির ডাক, নীল আকাশ আর অকৃত্রিম প্রকৃতি।

ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে একের পর এক প্রভাবশালী সায়েন্টিস্টের মৃত্যু। মৃত্যুর পিছনে কে দায়ী? কোনো টেররিস্ট সংস্থা নাকি কোনো এক পাগল বিজ্ঞানী?

কোথায় যেন এই তিন কাহিনিসূত্র মিলে যায়। খুনির ফেলে রাখা সংকেত উদ্ধারে MI6 সাহায্য নেয় অনিলিখার। তারপরে? রুদ্ধশ্বাস কল্পবিজ্ঞান রহস্যথ্রিলারের কেন্দ্রে আবার অনিলিখা।

দুটো উপন্যাসের মেরুদণ্ডই কল্পবিজ্ঞান।

এই বইটি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে যিনি মূল উদ্যোগ নিয়েছেন, সেই প্রিয় সাহিত্যিক ও পত্রভারতীর কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অনীশ দেবকে যিনি আমাকে এধরনের লেখায় সমানে উৎসাহ দেন।

তোমাদের এ বই পড়ে ভালো লাগলেই, লেখক-প্রকাশকের এই বই প্রকাশ সার্থক হবে।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

রেডিং, ইংল্যান্ড
৩রা জানুয়ারি, ২০১৮

সূচিপত্র



অনিলিখা ও হিরোসি



১

আর বেশি দিন বাকি নেই, যেদিন আমাদের সব কাজ রোবটরাই করবে! আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। একমাত্র কাজ হবে এভাবে একসঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া।—প্রতীক বলে উঠল।

—আর খাওয়া! রোবটরা কোনওদিনই খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের টেক্কা দিতে পারবে না। ওটাতে আমরা চিরকাল প্রথম থাকব।—আড়চোখে বিশ্বজিৎদার দিকে তাকিয়ে সহেলী বলে উঠল।

বিশ্বজিৎদা অষ্টম সিঙাড়াটা খেতে যাচ্ছিল। একটু কড়া চোখে সহেলীর দিকে তাকিয়ে হাত গুটিয়ে নিল।

আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় রোবট। বেশ বুঝতে পারছি প্রতীক এ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু পড়াশোনা করেছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে ফের বলে উঠল—সিঙ্গুলারিটি কাকে বলে জানিস?

সাগ্নিক খুব গম্ভীরভাবে উত্তর দিল,—রোবট যখন নিজেকে খুব একাকী মনে করে, সে মুহূর্তকে সিঙ্গুলারিটি বলে।

আমাদের বাকি সবার নীরবতা লক্ষ করে বেশ একটা তৃপ্তির হাসি হেসে প্লেটে রাখা চানাচুর একমুঠো নিয়ে প্রতীক ফের বলে উঠল,—এককথায় সিঙ্গুলারিটি হল সেই মুহূর্ত যখন রোবট আমাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে। অর্থাৎ ওদের হাতেই থাকবে সব কিছুর রাশ। বিজ্ঞানীরা বলছে সেদিন আর বেশি দূরে নেই। ২০২৯ সাল নাগাদ এরকম হবে।

—সেকি? সে তো আর কয়েকবছর মাত্র।—সহেলী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল।—তাহলে?

—এখনই যে হয়ে যায়নি, সে খবর কি আর আমরা রেখেছি?—প্রশ্নটা এল অনিলিখাদির কাছ থেকে। অনিলিখাদি দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চটি খুলতে খুলতে বলে উঠল।

বেশ কয়েকমাস বাদে অনিলিখাদি আমাদের শনিবারের আসরে এল। গত কয়েকমাস বেশিরভাগ সময় ভারতের বাইরে ছিল। মাঝে মধ্যে ভারতে এলেও আমাদের শনিবারের আসরে আসতে পারেনি।

খানিকক্ষণের জন্য অনিলিখা-এফেক্টে অন্য কোনও আলোচনা আর সম্ভব হল না। অনিলিখাদিকে এতদিন বাদে দেখার পরে অন্য কোনও প্রসঙ্গে কথা বলা প্রায় অসম্ভব।

অনিলিখাদির আনা বেশ কিছু সুইস চকলেট মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

মিনিট পনেরো বাদে আবার আমরা প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। আমরা না জানলেও অনিলিখাদির যে আসার কথা ছিল আর সে খবরটা যে কিচেন অব্দি পৌঁছেছিল, সেটা দিব্যি বোঝা গেল। মাসিমার হাতে বানানো ডিমের ডেভিল এর মধ্যেই এসে গেছে।

এই ভাগাড় কাণ্ডের জেরে বাইরের দোকানের ডেভিল খাওয়া সম্ভব নয়। আমরা সবাই সামনে খাবার টেবিলে হামলে পড়লাম।

অনিলিখাদি যে বেশ কয়েকমাস ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার প্রকাশ অনিলিখাদির পোশাকেও। পরনে একটা হাঁটু অব্দি নীলসবুজ উজ্বল স্কার্ট।

আমি প্রশ্ন করে উঠলাম,—তা তোমার কী মনে হয় রোবটরা আমাদের থেকে এখনই বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে?

—না, জেনারালি তা হয়তো বলা ঠিক হবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের থেকে রোবটরা কিন্তু এখনই বেশি বুদ্ধিমান। তা না হলে কি আর আমরা ওদের কাছে দাবায় হারি? যে খেলাটাকে সবথেকে জটিল খেলা বলা হয়, সেই 'অ্যালফা গো' বোরড গেমেও কম্পিউটার চীনের বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিয়েছে। বিশেষ বিশেষ স্পেসালাইসড ক্ষেত্রে ওরা আমাদেরকে ইতিমধ্যেই পিছনে ফেলে দিয়েছে। তবে

সিঙ্গুলারিটির প্রশ্নটা একটু আলাদা। —একটু থেমে টেবিলে পড়ে থাকা শেষ ডেভিলটা নিয়ে একটা আলতো কামড় দিয়ে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল,—

সেটা হতে হলে তিনটে শর্ত পূরণ করতে হবে। এক, রোবটকে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, হয়তো খানিকটা আত্মমর্যাদাবোধও তার সঙ্গে থাকতে হবে। দুই, নিজের প্রয়োজনমতো ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্ল্যান করার ক্ষমতা থাকতে হবে, যেটা করতে আমরা একদম এক্সপার্ট। আর তিন নম্বর, আশেপাশের পরিবেশ সম্বন্ধেও সচেতন হতে হবে। এ কাজগুলো কোনওটাই রোবটদের পক্ষে অতটা সহজ নয়। আর সেটাই আরটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বা কৃত্রিম বুদ্ধির গবেষণা যারা করছেন সেই বিজ্ঞানীদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এখনও অব্দি কোনও রোবট কীভাবে কথোপকথন চালিয়ে যেতে হবে, তা-ই জানে না! কমনসেন্স বলেও ওদের কিছুই নেই। যার সঙ্গে কথা বলছে তার মুখের ভাব বুঝে কোন কথাটা কখন বলতে হবে, তা বোঝে না। যেটা আমরা খুব সহজেই পারি।

—তা বিজ্ঞানীরা কি সেটা সত্যি চান, যে আমাদের থেকে ওরা বেশি বুদ্ধিমান হয়ে যাক?

—ঠিক বলেছিস। আমরা কখনোই চাইব না যে এরকম মুহূর্ত আসুক। টারমিনেটর সিনেমা তো দেখেছিস। সেরকম হলে কী হতে পারে সে তো সহজেই ভেবে নেওয়া যায়। সবার আগে আমাদের জায়গা ওরাই নেবে।

—যাক, তাহলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অন্তত কয়েক বছরের জন্য চাকরি-বাকরি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে হবে না। তা কবে নাগাদ সেরকম হবে বলে তোমার মনে হয়,—সাগ্নিক বলে উঠল।

অনিলিখা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ফের বলে উঠল—আসলে সেটা যে কবে হবে তা নিয়ে এ বিষয়ের এক্সপারটদের মধ্যেও কোনও সহমত নেই। কেউ বলছেন এটা আগামী দশ বছরে হবে। কেউ বা বলছেন, এটা হতে আরও একশো বছর লেগে যাবে। অনেকে আবার বলছেন যে, ওরা আমাদের থেকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট হলেও আমাদের তাতে কোনও ধরনের বিপদের আশঙ্কা নেই। ওরা আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই চলবে। তবে আমরা আর কতটুকু খবর রাখি। কোনও এক বিজ্ঞানীর কাজই সব ধ্যান ধারণা পালটে দিতে পারে।

গল্পের আভাস পেয়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল,—তা সেরকম কিছু ঘটনার কথা বলবে বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আজ সেটাই বলব বলে ভেবে এসেছিলাম। —বলে অনিলিখা ওর ব্যাগ থেকে একটা ডায়েরি বার করল। দেখেই বোঝা যায় বেশ দামি ডায়েরি। লেদারের কালো কভার। প্রথমদিকের কয়েকটা পাতা বাদ দিয়ে একটা পাতায় অনিলিখা থামল। তারপরে বলতে শুরু করল।

২

এখনকার দিনে যারা আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কিছুটা জানে, তারাই আসাহি-র সম্বন্ধে জানে। মেসিন লারনিং নিয়ে অক্সফোরডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে দীর্ঘকাল পড়াতেন। এ বিষয়ে পৃথিবীর অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে উনি একজন। এ বিষয়ে অজস্র পেপার আছে ওঁর। তা আসাহি শব্দের মানে জাপানিতে কী জানিস তো?

আমাদের চুপ দেখে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল—আসাহি মানে সূর্যোদয়। আসাহির জন্ম হিরোশিমাতে। ১৯৩৭ সালে। আসাহির যখন মোটে আটবছর বয়স, তখন হিরোশিমায় পরমাণু বোমা ফেলা হয়। ওঁদের পরিবারের সবাই মারা যায়। তা সে কথায় পরে আসছি। এটা ওঁরই ডায়েরি।

আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়েছিল ভারি অদ্ভুতভাবে। আমি বছর দু'য়েক আগে সুইজারল্যান্ডের লুসারনের একটা পাবে ঢুকে 'সুসান সাদারডে'-র ‘NagasakiLife After Nuclear War’ বইটা পড়ছি, হঠাৎ আমার

পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ভদ্রলোক বসে পড়লেন।

বুদ্ধিদীপ্ত ছোটখাট চেহারা। কুতকুতে চোখ, রিমলেস চশমা। চওড়া ভুরু। চোখের কোনও পাতা নেই। হাত বাড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। আসাহি।

ইংরেজি বেশ ভালোই বলেন, তবে খুব আস্তে আস্তে বলেন। একটু খেয়াল করে শুনতে হয়।

তা আমাদের কথা শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়েই। পরমাণু বোমা ফেলার সপক্ষে একটা যুক্তি এখন প্রায়শই শোনা যায় যে, সে সময়ে জাপানের উপরে পরমাণু বোমা না ফেললে যুদ্ধ আরও বেশ কয়েক বছর ধরে চলত। সব দেশেরই আরও অনেক লোক মারা যেত। জাপান সহজে হার মানত না।

১৯৪৫-এর জুনে মারিয়ানার মতো জাপানের অধীকৃত কিছু দ্বীপকুঞ্জ জয় করতে গিয়ে যা রক্তক্ষয় আর সামগ্রিক ক্ষতি হয়েছিল, তাতে অ্যালায়ান্স আর্মি বেশ টের পেয়েছিল যে আর যাই হোক, জাপানের মূল ভূখণ্ড জয় করা সহজ হবে না। কোনও ভাবেই জাপানিরা সহজে হার মানবে না। লক্ষ লক্ষ সেনা মারা পড়বে। দীর্ঘ এ যুদ্ধে অ্যালায়ান্স আর্মির মনোবলও হয়তো ভেঙে যাবে।

উলটোদিকে অন্য কোনও কৌশলও কাজ করছিল না। বিভিন্ন শহরে কারপেট বম্বিং করে জাপানের জনসাধারণের মনোবল ভেঙে দেওয়ার সবরকম চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ সাধারণ জাপানি দেশের জন্য প্রাণ দিতেও কোনওরকম দ্বিধা করত না। অনেকে সুইসাইড বোম্বার বা কামাকাজি হওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছিল।

তাই একমাত্র উপায় ছিল এরকম কিছু করা যাতে জাপানি লোকেদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া যায়। পরমাণু বোমায় একটা শহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে জাপান আত্মসমর্পণ করবে, সেটাই ছিল ধারণা। সেটা অবশ্য বাস্তবে হয়নি। হিরোশিমা আর নাগাসাকির পরেও যুদ্ধ থামত না, যদি না জাপানের সম্রাট আর্মিকে আত্মসমর্পণ করতে বলতেন।

—তাই নাকি?—তন্ময় বলে উঠল। এটা তো জানা ছিল না।

—হ্যাঁ, হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলার পরে একটা বিশেষ ক্যাবিনেট মিটিং ডাকা হয়। তাতে ভোটে দেখা যায় যে আত্মসমর্পণের পক্ষে ও বিপক্ষে একই ফল হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষেও একই ভোট পড়েছে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী সুজুকি তখন জাপানের সম্রাট হিরোহিতোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য অনুরোধ করেন। তখন সম্রাট হিরোহিতোই পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্রাটকে জাপানের সাধারণ লোক দেবতার মতো মনে করত। তাই ওঁর আদেশের পরেই তারা আত্মসমর্পণ করে। সবাই অস্ত্র সারেন্ডার করে। শত্রুসেনার হাতে ধরা দেয়। তবে অনেকেই হয়তো মন থেকে সেটা মেনে নিতে পারেনি।

তা এসব কথা বলতে বলতে ভালো আলাপ হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে। প্রথমে চিনতে পারিনি। ওঁর অনেক বই আগে পড়েছিলাম। কিন্তু ওই বই নিয়ে কোনও কথা না হওয়ায় প্রথমে এক সাধারণ জাপানির বাইরে অন্য কিছু মনে হয়নি। পরে পরিচয় পেয়েছিলাম।

বুঝতে পেরেছিলাম ইনিই বিখ্যাত বিজ্ঞানী আসাহি ইটো। রিটায়ারমেন্ট-এর পরে উনি ইংল্যান্ড ছেড়ে সুইজারল্যান্ডের লুসারনে চলে এসেছিলেন। কী কারণে তা অবশ্য জানতে পারিনি।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই আসাহি আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

এর পর থেকে যোগাযোগ ছিল। মূলত ইমেল মারফৎ। আমাদের বেশ কিছু কমন ইন্টারেস্ট ছিল। সে বিষয়ে ইমেল করতাম। উত্তর পেতাম। ওঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল।

দারুণ গল্পও বলতে পারতেন। কথায় কথায় মজা করতেন। অনেক গল্পের স্টক ছিল। আর বলতেনও খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে। এমনভাবে কথা বলতেন যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে হতো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব বড় ভক্ত ছিলেন। শুনেছিলাম ওঁর কোনও সতীর্থ শিক্ষক বাঙালি ছিলেন আর সেই সূত্রেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়। সে জন্য বাংলা ভাষাতেও বেশ আগ্রহ ছিল।

আমি ভালো কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীতের গানের লিঙ্ক পেলে ওঁকে পাঠাতাম। একটা জিনিস বেশ বুঝতাম যে ওঁর বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ দেখার মতো। এমন কোনও বিষয় ছিল না যা নিয়ে ওঁর বেশ ভালো জ্ঞান ছিল না। তবে একই সঙ্গে খানিকটা খামখেয়ালিও ছিলেন। অনেক সময় আমার ইমেলের দিনের পর দিন কোনও উত্তরই আসত না।

ছ'সপ্তাহ আগে আমি সুইজারল্যান্ডের জুরিখ গিয়েছিলাম। ওঁকে আগেই জানিয়েছিলাম যে আমি জুরিখ যাব। কোথায় থাকব তাও জানিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করার। ওঁর বাড়ি যাওয়ার। কিন্তু ওঁর দিক থেকে কোনও প্রত্যুত্তর পাইনি। তাই দেখা হবে না ধরেই নিয়েছিলাম।

জুরিখে একটা বড় কনফারেন্স ছিল। শহরের থেকে সামান্য দূরে সুইসহোটেলে ছিলাম। তা দ্বিতীয় দিন হঠাৎ রাত দশটার সময় হোটেলের রিসেপশন থেকে কল। আমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।

অবাক হলাম। এত রাতে তাও আবার জুরিখের মতো শহরে যেখানে আমার আত্মীয়-বন্ধু কেউ নেই, সেখানে আবার কে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তারপরে শুনি আর কেউ নন, আসাহি এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে-সঙ্গে নীচে নেমে আসি।

আসাহিকে দেখেই মনে হল কোনও কিছু নিয়ে যেন উনি খুব চিন্তায় আছেন। কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করছিলেন।

তারপর একটা ডায়েরি আমার হাতে দিয়ে বলে উঠলেন,—এটা তোমার সময়মতো পড়ো। আজকের ঘটনার পরে এটা আর আমার কাছে রাখার ভরসা পাচ্ছি না। কাল কি তুমি খুব ব্যস্ত আছ? পারলে আমার বাড়ি এসো।

—আজকে? কী ঘটনা? কোনও অসুবিধে হয়েছে?

—সে বিষয়ে পরে কথা হবে। তা কাল আসতে পারবে? আমার বাড়ি খুব দূরে নয়। অ্যাড্রেস, ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি। বলে আমাকে ডিটেলস দিয়ে দিলেন।

—তা ডায়েরিটা আপনি আপনার কাছেই রেখে দিন না। কালই না হয় নিয়ে নেব।

আসাহি হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালেন।—না, না এটা তোমার কাছেই রেখে দাও। আমার কাছে হারিয়ে যেতে পারে। এ ডায়েরি তোমার কাছেই রেখো। কাউকে দিও না।

অনিলিখা একটু থেমে বলে উঠল,—তা এ হল সেই ডায়েরি। তবে কিছু জায়গায় জাপানিতেও লেখা আছে। আমি শুধু ইংরাজি অংশটুকুই পড়তে পেরেছি।

—কই, কই দেখি ডায়েরি!

আমাদের হাতে ডায়েরিটা মিনিটখানেক ঘুরল। খুব সুন্দর হাতের লেখা। কিন্তু খুব ছোট ছোট করে লেখাটা।

আবার ফেরত নিয়ে অনিলিখাদি বলে উঠল, আসাহি যাওয়ার আগে ওঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে গেলেন। ট্রেনে করে লুসারন গিয়ে সেখান থেকে বোটে করে যেতে হবে। গাড়ি চালাতে পারলে সুবিধে হতো, কিন্তু সুইজারল্যান্ডের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই বলে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উপরে ভরসা করাই ভালো। এমনিতেও সুইজারল্যান্ডে সব কিছু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। তাই কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

পরের দিন খুব ভোরবেলা অফিস ছিল। কিন্তু তবু ডায়েরির কয়েকটা পাতা পড়লাম।

তোদেরকে ডায়েরির থেকে কিছু অংশ আগে পড়ে শোনাই। তারপরে আমার নিজের ওঁর বাড়িতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা শোনাব। আসাহি শিক্ষক ছিলেন। বই লিখেছেন। তাই ওঁর এই ডায়েরি লেখার একটা গুন হল, খুব আকর্ষণীয়ভাবে লেখা। এজন্যই বোধহয় উনি ওঁর সাবজেক্টের লেখক হিসেবেও এতটা সফল ছিলেন। আমি বিশেষ কিছু দিনের কথা বলছি যেখানে উনি ওঁর তৈরি রোবট সম্পর্কে লিখেছেন।

অনিলিখা পড়তে শুরু করল।

৩

১২ই জানুয়ারি

ওর নাম রাখলাম হিরোসি। যার অর্থ উদারতা। আমার মনে হয় এই উদারতা আমাদের সবার মধ্যে থাকলে এই পৃথিবীটা অন্যরকম হতো। সবাই যদি সবার বিপদে এগিয়ে যেত, তাহলে আমাদের সমাজটা কীরকম হতো ভাবা যায়! এই পৃথিবীতে আমাদের সবার যা দরকার, তার থেকেও অনেক বেশি কিছু আছে। কিন্তু তবু আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ শিশু অনাহারে মরে। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধ বিগ্রহে মারা যায়।

আমি চেয়েছিলাম হিরোসিকে একদম অন্যরকম করে তৈরি করতে। হয়তো ওই হবে পৃথিবীর প্রথম বুদ্ধিবিমান রোবট শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই এই উদারতা ওর থেকে অন্যদের মধ্যেও একই ভাবে ছড়িয়ে পড়বে সে আশা রাখি। ওকে তৈরি করা হয়েছে শান্তির দূত হিসেবে। ওর জটিল অ্যালগরিদম সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজবে।

ওকে দেখতে ঠিক আট-নয় বছরের বাচ্চাদের মতো। সাড়ে তিনফুট হাইট। যেভাবে তৈরি করেছি তাতে যে কেউ ওকে ওই বয়সের বাচ্চা বলেই ভুল করবে। ওর চোখেমুখে এমন একটা সারল্য আছে যে তৈরি করার পরে আমার নিজেরই মনে হচ্ছিল না যে ও একটা রোবট। ওর দিকে তাকালেই তাই একটা অন্য ধরনের অনুভূতি হয়। মনে হয় ও ঠিক আমাদেরই একজন।

আমার ধারণা হিরোসির মতো রোবট আর নেই।

তবে ওর আসল বিশেষত্ব চেহারায় নয়। ওর আসল ক্ষমতা হল শেখার ক্ষমতা। আর সেখানেই আমার দীর্ঘ দিনের পড়াশোনা, রিসার্চ কাজে লেগেছে। দিনের পর দিন মেশিন লারনিং-এর বিভিন্ন জটিল অ্যালগরিদম নিয়ে ওর উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। ও চারপাশের সব কিছু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে, বোঝে, আর সে বুঝে কাজ করার ক্ষমতা রাখে।

এই তো আজকেরই ঘটনা। আমার পোষা বেড়াল পিটার সোফায় উঠে পিঠ চুলকোচ্ছিল। গতকাল বাইরে বাগানে ও একটা রবিন পাখি মেরেছে। সেটা হিরোসির চোখ এড়ায়নি।

পিটার হিরোসিকে বিশেষ পছন্দ করে না। কেন জানি না। ওকে দেখে একবার ফ্যাশ ফ্যাশ করে উঠল।

দেখি তা দেখে হিরোসি গম্ভীর মুখে বলে উঠল—নটি ক্যাট।

হিরোসিকে চারজিং-এর ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে। ছ-সাত ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে ফুল চারজ করতে। তবে তারপরে দিন তিনেক চলছে। সেটা ও নিজেই সময় মতো করে নেয়।

অনিলিখাদি আবার বেশ কিছু পাতা ওল্টাল। ফের একটা পাতায় থেমে বলতে শুরু করল।

৩রা এপ্রিল

গত কয়েক মাস থেমে থাকিনি। এখন হিরোসির মধ্যের কৃত্রিম বুদ্ধির প্রোগ্রামলজিক আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

হাতি, ডলফিন আর বাঁদরের মধ্যে একজায়গায় খুব মিল। এদের আয়নার সামনে দাঁড় করালে এরা কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝে যাবে যে আয়নায় নিজেদেরকেই দেখছে। কিন্তু একটা গণ্ডারের সামনে কিছু দূরে আয়না রাখলে, গণ্ডার ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করবে। বেশিরভাগ প্রাণীর ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। তারা মনে করবে তাদের এলাকায় আরেকটা নতুন প্রাণী এসে গেছে। তাই আক্রমণ করবে।

এটাকে খুব সামান্য একটা ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটা একটা বিশাল বড় ক্ষমতা। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনতার একটা বড় পরীক্ষা। এ বিষয়ে আমাদের টেক্কা দিতে পারে এরকম অন্য কোনও প্রাণী নেই। আমরা তাই আয়নার সামনে দাঁড়াতে এত ভালোবাসি।

তা এ বিষয়ে হিরোসি কী করে সেটা একটু দেখা দরকার ছিল। আমি ওকে এতদিন কোনও আয়নার সামনে যেতে দিইনি। আজ ওকে একটা আয়নার সামনে দাঁড় করালাম।

ও প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল। তারপরে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম আমার প্রতিবিম্ব আয়নায় পড়েছে। ও সেটা দেখছে। তারপরে আস্তে আস্তে কাঁচের দিকে এগিয়ে গেল। আয়নার পিছন দিকটাও দেখল।

তারপরে ফিরে এসে আয়নার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল। বুঝতে পেরে বাচ্চাদের মতো আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। পরের পাঁচ মিনিট ওর কাণ্ডকারখানা দেখে এটুকু বুঝেছি অনেক দিক দিয়ে ও এখন একদম একটা দু'বছরের মানব শিশুর মতো। নিষ্পাপ।

১৬ই এপ্রিল

আমাদের বাড়ির থেকে খানিকদূরে একটা ক্রিকেটের মাঠ আছে। ওখানে এখানকার কয়েকটা ছেলে খেলে। বছর চোদ্দ-পনেরোর। এদের মধ্যে তিনজন ছেলে আমার বাড়ি গত কয়েক মাসে কয়েকদিন এসেছে। তখন অবশ্য আমি ওদের সামনে হিরোসিকে নিয়ে আসিনি। হিরোসির কথাও বলিনি। ওরা ঠিক কোথায় থাকে জানি না। তবে কয়েকমাস আগে দেখিনি।

আজ হিরোসিকে নিয়ে ওই মাঠে গিয়েছিলাম। পরীক্ষা করে দেখতে যে ও কমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে কীভাবে মেশে। দেখলাম ও চুপ করে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ ওদের খেলা দেখল।

ছেলেগুলো প্রথমে ওকে দেখে বুঝতে পারেনি যে ও একটা রোবট। কাছ থেকে দেখে তবে বুঝতে পারল। ওর বিশেষ ক্ষমতার কথা আমার কাছে শুনে ওর সঙ্গে আলাপ করার খুব আগ্রহ। কিন্তু হিরোসির দিক থেকে তেমন আগ্রহ দেখলাম না। কেন বুঝলাম না ও প্রায় তেমন কোনও কথাই বলল না।

যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই।

—কী নাম তোমার?

—হিরোসি।

—আমরা তোমাকে হিরো বলে ডাকব। ক্রিকেট ভালো লাগে?

—না।

—আমাদের সঙ্গে খেলবে?

ও দেখলাম চুপ করে রইল। কোনও উত্তর দিল না।

বুঝলাম ওদের বিশেষ পছন্দ হয়নি। ওরা আরও এরকম কিছু প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর উপরে আগ্রহ হারাল।

রোবটদের পক্ষে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। কারণ ওরা কী কথা বলবে তা খুঁজে পায় না। কিন্তু হিরোসির পক্ষে এটা শক্ত কাজ হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি আমার গবেষণা সফল নয়?

আমি তো ওর সঙ্গে নিজে কথা বলে দেখেছি। দরকার মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে যেতে পারে। আমার ছোটবেলা নিয়ে কত কথা ওর সঙ্গে হয়। কতবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে। অন্যজন কখন কী ধরনের কথা শুনতে আগ্রহী সে বিষয়ে ওর অত্যন্ত উন্নত অ্যালগরিদম ওকে গাইড করে। যেমন ওর এক্ষেত্রে ক্রিকেট নিয়ে বা ওরা কখন খেলতে আসে, কোথায় থাকে, কোন স্কুলে যায়—এসব বিষয় নিয়ে দু-একটা প্রশ্ন করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা ও করল না।

তাহলে কি এর পিছনে অন্য কিছু কারণ আছে? ওর কি এদের পছন্দ নয়? কে জানে?

৬ আগস্ট

আজকের দিনটা এলেই আর অন্য কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না। শুধু সেই দিনটার কথা চোখে ভাসে। মনে হয় ঠিক যেন কালকের ঘটনা। আমি সেই স্মৃতি পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু বারে বারে সেই দিনটা ফিরে ফিরে আসে।

একটা দিনই অনেক কিছু পালটে দিতে পারে। ঠিক যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

সেদিন বেশ ঝকঝকে দিন ছিল। সকালে বাড়ির বাইরে খেলতে গিয়েছিলাম বোনের সঙ্গে। আমার তখন আট বছর বয়স। আর আমার বোনের চার। আমার বাবা ছিল ডাক্তার।

হঠাৎ এয়ার রেড অ্যালারম শুনে বাড়ি ফিরে আসি। এটাই ছিল তখনকার নিয়ম। কিছুক্ষণ বাদে বাবা জানায় সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আর ভয় নেই। এমনিতেও হিরোসিমাতে ততদিন অব্দি খুব কমই বোমা পড়েছিল।

আমরা সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট খেতে বসলাম। বোনের কথা শুনে আমরা সবাই হাসছিলাম। খুব বোকা ছিল ও। খেতে বসে অর্ধেক খাবার নিজের গায়ে ফেলত।

বাবা কী যেন একটা কথা বলছিল।

হঠাৎ কী যেন হল। একটা খুব উজ্জ্বল আলো যেন জানলা দিয়ে আচমকা হানা দিল। তার সঙ্গে একটা শব্দ। তার কয়েকমুহূর্ত পরেই একটা প্রচণ্ড গরম ঝোড়ো হাওয়া যেন কোথা থেকে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। আর আমরা সবাই তার ধাক্কায় বাড়ির বিভিন্ন দিকে ছিটকে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল, সারা গায়ে কাঁচ ঢুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল। চারদিক অন্ধকার। দমবন্ধ হওয়া পরিবেশ। আগুন জ্বলছে চারদিকে। খেয়াল করলাম আমি ভাঙা দুটো কাঠের দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়েছি।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বোনের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আস্তে আস্তে বোনের চিৎকার ক্ষীণ হতে শুরু করল। আমারও কিছুক্ষণ কথা বলার অবস্থা ছিল না। পরে সমস্ত শক্তি একত্র করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

বেশ খানিকক্ষণ চিৎকার করার পরে বাবার সাড়া পেলাম। আসলে আমি যেখানে আটকে পড়েছিলাম, সেখান থেকে উদ্ধার করা আদৌ সোজা ছিল না। তার মধ্যে আবার বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক চেষ্টার পরে বাবা আমাকে উদ্ধার করে। বাবার সারা গায়ে তখন রক্ত লেগে।

বোন-এর সামান্য আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল তখনও। দূর থেকে যেন বলে উঠছে—বাবা, মা,—আমাকে বাঁচাও। আমি আর থাকতে পারছি না।

কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও বোনকে উদ্ধার করা যায় নি।

ইতিমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো বাড়িতে। কোনওরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম বাবা-মা'র হাত ধরে। মা তবু বারবার বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছিল বোনের কথা ভেবে। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছিল যে বোনের আর বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই।

খানিকবাদে বৃষ্টি এসেছিল। আমরা সবাই সেই বৃষ্টির জলে তেষ্টা মিটিয়েছিলাম। কালো কালো সে জল। আমরা সবাই তখন কাঁদছিলাম। বাবার চোখেও জল। মনে হচ্ছিল আকাশও যেন আমাদের দেখে কাঁদছে।

মা একদিন বাদে মারা গিয়েছিল। বাবা মারা যায় পাঁচ দিন বাদে। আমি মাস খানেক হাসপাতালে ছিলাম।

সে সময় এক অন্য ধরনের মানুষকে দেখতে পেতাম। পুড়ে যাওয়া মানুষ। তাদের গায়ের রঙ পুরো কালো। কুচকুচে কালো। রোজ দেখতাম আমার পাশেই কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। সে যেন ছিল এক মৃতের শহর।

সে মৃত্যুর মিছিল তারপরেও বহু বছর থামেনি। তেজস্ক্রিয়তার জন্য কত যে মৃত্যু হয়েছিল তার কোনও হিসেব নেই।

পরে জেনেছিলাম সেদিন হিরোশিমায় পৃথিবীর প্রথম পরমাণু বোমা পড়েছিল। ওই বোমা যেখানে পড়েছিল আমাদের বাড়ি ছিল তার থেকে ঠিক তিন মাইল দূরে।

হাসপাতালের জানলা দিয়ে একদিন বাইরেটা দেখেছিলাম। মনে হচ্ছিল এ যেন এক অন্য পৃথিবী। সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আবার নতুন করে যেন মানব সভ্যতার যাত্রা শুরু হবে। শহর জুড়ে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে আমাদের বাড়িটাকে খুঁজছিলাম। তার কোনও অস্তিত্ব ছিল না, আমাদের পরিবারের মতোই, সে বাড়িটাকেও আর খুঁজে পাইনি। হাসপাতাল থেকে আমি একাই ফিরেছিলাম।

পথে যেতে যেতে একটা ভাঙা বাড়ির দেওয়ালে দেখেছিলাম একটা মানুষের প্রতিচ্ছবি। বোমার উত্তাপে সে ভস্মীভূত হয়ে দেওয়ালে মিশে গিয়েছিল। শুধু পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দেহের ছাপ রয়ে গিয়েছিল। সে ছাপ শুধু দেওয়ালে নয়, রয়ে গেছে আমার মনেও।

মানুষ কত সহজে এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমি চাই না আমার হাতে তৈরি কোনও সৃষ্টি ওই পরমাণু বোমার মতো হোক।

তাই আমি হিরোসিকে তৈরি করেছি অন্যভাবে। ওকে শিখিয়েছি যাতে ও সবসময় অন্যদের ক্ষমা করতে পারে। কখনও কোনওভাবে হিংসার আশ্রয় না নেয়। নিরীহ মানুষের উপরে যাতে কোনওদিন আক্রমণ না করে। এধরনের সৃষ্টির সময়ে সব রকমের সাবধানতা নিতে হয়, কারণ একবার ভুল সৃষ্টি হয়ে গেলে পিছনে হাঁটা যায় না।

কিন্তু মাঝেমধ্যে ভাবি আমার মনের গভীরে অন্য কোনও মানুষ লুকিয়ে নেই তো? ওকে আমি যতই শেখাই না কেন, আমি নিজে কি পেরেছি সবাইকে ক্ষমা করতে? আমি কি পেরেছি সেদিনের কথা ভুলে যেতে?

১৫ই আগস্ট

এধরনের রোবট তৈরির সময় একটা বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হয়, তা হল ওর মধ্যে ওর নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও রকম সচেতনতা তৈরি হচ্ছে কিনা। যাকে বলা হয় কনশাসনেস। নিজের সম্বন্ধে সচেতনতা, চারদিকে কী হচ্ছে সে বিষয়ে সচেতনতা, আর ভবিষ্যতের জন্য ভেবেচিন্তে কোনও কাজ করার ক্ষমতাকে আমি এই কনশাসনেস বলি।

আমার আর হিরোসির মধ্যে এখানেই খানিকটা তফাত। আমি যা করি তা ভবিষ্যতের কথা ভেবে করি। ও তা করে না। যখনই কোনও রোবট এটা করতে শিখে যাবে, তখনই মানবজাতির পক্ষে তা বড় বিপদ। ওরা তখন ওদের নিজেদের স্বার্থ দেখবে। আমাদের নয়। তাই হিরোসিকে যতই বুদ্ধিমান তৈরি করি না কেন, এই জায়গাতে আমাকে রীতিমতো সূক্ষ্ম ব্যালেন্স রক্ষা করতে হয়েছে। অনেকটা সরু দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো।

আমি এর উপরে একটা বিশেষ স্কেল তৈরি করেছি, নাম দিয়েছি আসাহি স্কেল। এ স্কেলে শূন্য মানে তার মধ্যে কোনও কনশাসনেস নেই, আর দশ হল সবথেকে বেশি।

ধরা যাক একটা পেরেক, তাকে যত মারাই হোক না কেন, সে কোন প্রতিবাদ করবে না। তার কোনও বোধবুদ্ধি নেই। অর্থাৎ পেরেকের লেভেল হল শূন্য। কিন্তু একটা থারমোস্টাট উষ্ণতা সেন্স করতে পারে, সে অনুযায়ী ঘরের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমার স্কেলে থারমোস্টাট হল লেভেল ১। কৃমি খাবারের উপস্থিতি বুঝতে পারে। তাই কৃমিকে আমি লেভেল ২ দেব। একটা চড়াই পাখি তার থেকে আরেকটু এগিয়ে। সে দেখতে পায়, শুনতে পায়, গন্ধ পায়, চাপ অনুভব করতে পারে। তাকে আমি ৩ দেব। এভাবে এই স্কেল কাজ করে।

রোবটদের সবথেকে দুর্বল জায়গা হল প্যাটার্ন বোঝার ক্ষমতা। বিভিন্ন সেনসরের মাধ্যমে চারপাশের পরিবেশ বোঝার ক্ষেত্রে ওরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকলেও সে তথ্য দিয়ে কী করতে হবে তা

ওরা ভালো বুঝতে পারে না। এটা একটু বুঝিয়ে বলি।

একটা রোবট কোনও লোকের সঙ্গে যখন কথা বলে, তখন তার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারে না, যে সে রেগে যাচ্ছে না খুশি হচ্ছে, নাকি সে ওই কথায় কোনও মনোযোগই দিচ্ছে না। সব মিলিয়ে এখনকার সেরা রোবটদেরকেও আমি এজন্যই ৩ বা ৪ এর বেশি দেব না। সেখানে হিরোসি আমার স্কেলে ৭। সে ক্ষমতা আমি হিরোসিকে দিয়েছি। তবে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। দেখা দরকার ও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিনা। আমার ধারণা ও সেটা করবে না।

গত কয়েকদিন হিরোসিকে একাই বাইরে যেতে দিয়েছি। আজও তাই। আসলে ও যত সবার সঙ্গে কথা বলবে, তত তাড়াতাড়ি শিখবে। ও যখন আমার চোখের বাইরে থাকে, তখন ও কীভাবে চারদিকের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়, সেটাও জানা দরকার। ওর স্বভাবের পরিবর্তন থেকে আমিও বুঝতে পারব, কোথাও ওর প্রোগ্রামে কোনও পরিবর্তন আনার দরকার আছে কিনা। আমাকেও অবশ্যই ওর উপরে নজর রাখতে হবে। সবাই তো আর ওর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করবে না। উলটোটাই হয়তো স্বাভাবিক।

ও কোনদিকে যাবে জানতাম। ও বেরোনোর খানিকক্ষণ পরে ওই দিকে এগোলাম।

আমাদের এখানে লোকসংখ্যা খুব কম। আমার বাড়িটা পাহাড়ের উপরে। আরও ফাঁকা জায়গায়। পাহাড় থেকে পথ ধরে খানিকটা নেমে এলে একটা উপত্যকা পড়ে। সেখানেই ওই মাঠটা, যেখানে সেদিন ছেলেগুলোকে দেখেছিলাম।

দূর থেকে দেখলাম হিরোসিকে ওরা খেলায় নিয়েছে। তবে বল কুড়িয়ে আনার জন্য। আর হিরোসি ওদের আদেশ মতো ভারি খুশি হয়ে মাঠের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করছে।

আমি ওদের চোখের বাইরে ছিলাম। দেখলাম ওরা হিরোসিকে ঠিকভাবে খেলায় নিচ্ছে না। বল বা ব্যাট করতে দিচ্ছে না। মাঝেমধ্যে ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। ও কীভাবে সেটাকে নেয়, সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করলাম।

ও কিন্তু তার জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তি না দেখিয়ে ওদের আদেশ মতো হাসিমুখে ওদেরকে সাহায্য করতে থাকল।

আসলে ওর মধ্যে শান্তির বাণী এতটাই সুপ্রতিষ্ঠ, যে ও সব পরিস্থিতিতে সবার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলবে। ওর কোনও প্রতিবাদের ভাষা জানা নেই।

১৮ আগস্ট

আজ একটু অন্যধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম হিরোসিকে নিয়ে। তার আগে ওই কনশাসনেসের তৃতীয় শর্ত নিয়ে একটু বলি। এই তৃতীয় শর্ত হল ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোবট কী উপায় বার করবে, কী সিদ্ধান্ত নেবে তার ক্ষমতা। অর্থাৎ যাকে বলা যায়-'স্ট্রাটেজি ফর ফিউচার'।

জীব জগতে আগামীকাল বলে কিছু হয় না। প্রায় সব প্রাণীই সেই মুহূর্তের তাগিদের বাইরে কিছু ভাবে না। একমাস পরে কী হবে, এক বছর বাদে কী হবে এ সব ভেবে তারা কোনও কাজ করে না। সেটা হলে সিংহ আগামী একমাসের শিকার আগাম ধরে রাখত। এমন কী শীতের সময়ের কথা ভেবে মেরু ভালুকের মতো কিছু প্রাণী যা করে সেটা নেহাৎই জেনেটিক। প্ল্যান মাফিক কিছু নয়।

একমাত্র মানুষই এটা করতে পারে। শুধু জীবিত থাকার সময়ই নয়, আমরা আমাদের মৃত্যুর পরেও কী হবে সে কথা ভাবি। তা না হলে তো আমরা পিরামিডও পেতাম না। এটা হলে কী হবে, এটা না হলে কী হবে এ ধরনের বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা ভেবে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রোবট কি তা পারে না! তাহলে 'ডিপ ব্লু' কম্পিউটার কী করে দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারায়? দাবার ঘুঁটির বিভিন্ন কম্বিনেশনে কী কী সম্ভাবনা হতে পারে, চার-পাঁচ চাল পরে কী হবে এসব ভাবতে না পারলে কম্পিউটার কী করে জিততে পারে?

উত্তরটা সহজ। রোবট যখন কোনও একটা বিশেষ কাজের জন্য তৈরি হয় তখন এধরনের সিমুলেশন সেই বিশেষ কাজের জন্য আমাদের থেকে অনেক ভালো করতে পারে। কিন্তু সব কাজের জন্য তা পারে না।

কিন্তু এখানে হিরোসি সাধারণ রোবটের থেকে আলাদা। আর তাই আরও পরীক্ষা নেওয়া দরকার, যাতে বুঝতে পারি বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে ও কীভাবে কাজ করে।

আমার সেক্রেটারি মার্ক। গত একবছর ধরে ও আমার সঙ্গে আছে। মার্ককে বলেছিলাম হিরোসিকে সঙ্গে নিয়ে আমার কিছু দরকারি বই ছিঁড়ে ফেলতে।

প্রথম কথা এতে বুঝতে পারব এরকম কিছু আদেশ পালন করার আগে হিরোসি কিছু বাধা দেয় কিনা। নাকি এক ধরনের খেলা ভেবে এটা করে ফেলে।

নাহ, বই ছিঁড়তে ও আদৌ কোনও বাধা দেয়নি। বই জাতীয় কোনও কিছু ছিঁড়ে ফেলা যে খারাপ—এ বিষয়ে ওকে সচেতন করার জন্য ওর প্রোগ্রামে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। হিরোসি বেশ আনন্দের সঙ্গেই আমার লেখা তিন তিনটে বই মার্কের সঙ্গে বসে ছিঁড়েছে। আরো বই নাকি ছিঁড়তে চাইছিল। মার্কই বারণ করে।

আমি মার্ক ও হিরোসিকে কয়েক ঘণ্টা বাদে একসঙ্গে ডাকলাম। আমার হাতে ছেঁড়া সব বই। দেখলাম হিরোসি অন্যদিকে মুখ করে আছে আর ওর মুখের মধ্যে একটা অপরাধী অপরাধী ভাব ফুটে উঠছে।

গম্ভীর গলায় ওদের লক্ষ্য করে বললাম ওদের মধ্যে কে ছিঁড়েছে তা আমি জানতে চাই। মার্ককে আগে থেকেই বলা ছিল যাতে ও কোনও অপরাধ স্বীকার না করে। ও তাই বেমালুম অস্বীকার করল। আর হিরোসির পক্ষে যে এটা করা সম্ভব, তাও একইসঙ্গে জানিয়ে দিল।

হিরোসিকে জিজ্ঞাসা করতেই হিরোসি কিন্তু একবারে সব দোষ স্বীকার করে নিল। আর একটু বকাও খেল এর জন্য। অবাক ব্যাপার হল ও একবারও মার্কের কথা বলল না। আমি এর পরে মার্ককে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে ওকে আলাদা করে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তখনও ও মার্কের কথা না বলে নিজেই পুরো দোষ স্বীকার করে নিল।

এর কারণ কী? ও কি এটা বুঝেছে যে ওর মার্কের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা খুব দরকার। বেশিরভাগ সময় আমি যখন থাকি না, তখন ওর বিভিন্ন আবদার মার্কই রাখে, তাই?

মনে মনে একটু খুশিই হলাম। ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করতে শিখছে।

এখানে একটা দরকারি কথা বলা দরকার। হিরোসিকে আমি সব নিয়মের বাইরে রেখেছি। ইচ্ছে করেই।

রোবটিক্সের তিনটে মূল সূত্র যার কথা অ্যাসিমভ লিখে গিয়েছিলেন। ১, রোবট কখনও মানুষের ক্ষতি করবে না বা ক্ষতি হতে দেবে না। ২, রোবট সব সময় মানুষের নির্দেশ মেনে কাজ করবে, যদি না তা প্রথম শর্তের পরিপন্থী হয়। ৩, রোবট নিজেকে রক্ষা করবে যদি না তা প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত ভাঙে। তিনটে সূত্র ক্রমানুসারে প্রযোজ্য।

আমি কিন্তু হিরোসিকে এ সবের বাইরে রেখেছি। কারণ এটা মানলে ওর মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধির প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবে হবে না। আমার পরীক্ষাও সফল হবে না।

এতক্ষণ অনিলিখাদি পড়ছিল ডায়েরি থেকে। আমরাও চুপ করে শুনছিলাম। এতক্ষণে থামল।

তারপরে আস্তে আস্তে বলে উঠল—বাকিটা না হয় পরের শনিবারে বলা যাবে।

বলা বাহুল্য আমরা সবাই এখনই শোনার জন্য নাছোড়বান্দা। কে আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারে! তাও অনিলিখাদি পরের সপ্তাহে এ দেশে থাকবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অনেক অনুরোধের পরে অনিলিখাদি ফের শুরু করল—

৪

পরের দিন আমি কথামতো অফিসের পরে আসাহির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

জুরিখের মেন স্টেশন 'জুরিখ হপব্যানহফ' জুরিখের পুরনো শহরতলীর কাছে। জার্মানে 'হপব্যানহফ' কথার অর্থ হল প্রধান স্টেশন। প্রায় অনেক শহরের মূল স্টেশনকেই তাই 'হপব্যানহফ' বলা হয়।

সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করা হয়। চারটে সরকারি ভাষা—জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান আর রোমানশ। সুইজারল্যান্ডের যে অংশ ফ্রান্সের কাছে সেখানে মূলত ফ্রেঞ্চ কথা হয়। তবে সব থেকে বেশি লোক জার্মানেই বলে। বিশেষ করে জুরিখে প্রায় সবাই জার্মানই বলে। তা জুরিখ থেকে লুসারনে একটা দোতলা ট্রেনে গেলাম। ভারি সুন্দর সে ট্রেনের পথ। লুসারনের কাছে আসতেই দূরে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা যায়।

লুসারন থেকে আবার একটা বোটে করে সারনেন। গাড়ি থাকলে সরাসরি সারনেন অব্দি যাওয়া যেত। সারনেন পৌঁছলাম সাতটা নাগাদ। সেখান থেকে গাড়িতে করে আরও মিনিট পনেরোর রাস্তা।

সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে ওখানে সাড়ে আটটা অব্দি আলো থাকে। তাই তখনও বাইরে বেশ আলো ছিল।

আসাহি বলেছিলেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। না দেখে ওঁকে ফোন করলাম। ফোনেও পেলাম না। অবাক হলাম। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। আসাহির মতো মানুষ আমার আসার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন, এটাও ভাবা যায় না।

কী করব ভাবছি, হঠাৎ দেখি একটা কালো জাগুয়ার গাড়ি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ি থেকে যিনি নামলেন, তাকে আগে কখনও দেখিনি। বেশ স্মার্ট সুন্দর চেহারা। মাঝারি হাইট। মুখটা একটু গম্ভীর।

গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করে বলে উঠলেন,— আমি মার্ক। আমি এখন হাসপাতাল থেকে আসছি। আজ সকালে স্যার হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অজ্ঞান অবস্থায় ওঁকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাই।

—এখন কেমন আছেন?—উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠি।

একটু দ্বিধা করে মার্ক অপ্রত্যাশিত খবর দেয়। বলে ওঠে,—দু'ঘণ্টা আগে মারা গেছেন। আপনার আসার কথা আমাকে স্যার আগেই বলেছিলো। তাই আমি এলাম। আপনি কি হাসপাতালে যেতে চান?

বলা বাহুল্য, আমি এরকম একটা সংবাদের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না।

—অবশ্যই আমি ওঁকে একবার শেষ বিদায় জানাতে চাই। তা ওঁর ফিউনারাল কখন হবে?

—সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে মৃত্যু। তাই করোনার পোস্ট মরটেম করতে চান। তারপরে পোস্ট মরটেম রিপোর্ট পাওয়ার পরে ফিউনারাল ঠিক করা হবে।

মার্ক-এর সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ওখান থেকে সোজা হাসপাতাল। ওঁর মরদেহ একটা কাঁচের ঘরে রাখা আছে। খুব খারাপ লাগছিল যে কাল ওঁর সঙ্গে আরেকটু কথা বলতে পারলাম না। কিন্তু উনি কি ওঁর মৃত্যুর কোনও আগাম আভাস পেয়েছিলেন? তা না হলে আমাকে হঠাৎ ওঁর ডায়েরি দিতে গেলেন কেন?

এই ডায়েরির কথা অবশ্য আমি মার্ককে জানাইনি। তবে আসাহির ডায়েরি পড়ে মার্ক সম্বন্ধে সামান্য ধারণা হয়েছিল। মনে হয়েছিল মার্ককে উনি যথেষ্ট ভালোবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন।

ওঁর খুব একটা পরিচিত আত্মীয় কেউ এখানে নেই। কয়েকজন প্রতিবেশী এসেছেন দেখতে। শুনলাম আসাহির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ নেই, যাকে খবর দেওয়া হবে। এক অক্সফোর্ডে ওঁর অনেক বন্ধু আছে। তাঁরা আসবেন, তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ বড় হার্ট অ্যাটাক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পোস্ট মরটেম-এর পরে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এই জায়গাটা এত প্রত্যন্ত যে এখানে কোনও হোটেলও নেই। আমার অবশ্য থাকার অসুবিধে নেই। রাতটা আসাহির বাড়িতেই থাকব। সেরকমই কথা ছিল।

হাসপাতাল থেকে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ আসাহির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। হাসপাতালের থেকে কুড়ি মিনিটের পথ। লেক সারনেন এর পাশ দিয়ে পাহাড়ি রাস্তা।

আমাকে কিছু একটা যেন বলবে বলবে করছিল মার্ক। একটু ইতস্তত করে বলে উঠল,—জানি এত রাতে অন্য জায়গায় যাওয়া মুশকিল, কিন্তু আপনি শিওর তো যে ওখানেই থাকবেন আজ রাতে? চাইলে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতেও যেতে পারেন।

একটু অবাক হয়ে বলে উঠলাম,—কেন? কিছু অসুবিধে আছে? আমি কাল সকালেই চলে যাব। ওঁর বাড়িতে জায়গার কোনও অসুবিধে আছে?

—না, না ওখানে প্রচুর জায়গা। আসলে আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। ওখানে কিন্তু আপনাকে হিরোসির সঙ্গে আজ রাত কাটাতে হবে। অবশ্য বাড়িতে এক কাজের লোকও আছে। কিন্তু সে আবার ভালো ইংরেজি জানে না।

—কেন? তাতে কিছু অসুবিধে আছে? হিরোসি কি নতুন আগন্তুক দেখলে ভয় পায়?

—না, না। ও সেদিক থেকে মিশুকে। সব কিছু বুঝে যায় চট করে।

—তবে? তা হিরোসি কি বাড়ির সব জায়গায় যেতে পারে? না কি কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় বন্ধ থাকে?

—প্রথম দিকে বাড়ির মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু জায়গার মধ্যে ও থাকত। পরে প্রফেসার সব জায়গাতে যেতে অনুমতি দেয়। এমনকী মাঝেমধ্যে বাড়ির বাইরেও। তা আপনার প্রফেসারের সঙ্গে আলাপ কীভাবে? ওঁকে কীভাবে চিনতেন?

বললাম আমাদের দু'বছর আগে লুসারনে দেখা হওয়ার কথা। তার পরে মূলত ইমেল মারফৎ যোগাযোগ রাখার কথাও বললাম।

কথা বলতে বলতে আমরা বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি। উপর থেকে দূরের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। দূরে তাকালে মনে হচ্ছে পাহাড় যেন মোমবাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। খেয়াল করলে বোঝা যায় এ দিকে বাড়ির সংখ্যা খুব কম।

মার্ক বলে উঠল,—এ বাড়ি ১৫০০ সাল নাগাদ তৈরি হয়। বিখ্যাত পাবলো পরিবার এখানে থাকত প্রায় তিনশো বছর ধরে। ওদের বিশাল খনির ব্যাবসা ছিল। তার পরে বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়ে তা প্রফেসারের হাতে আসে। বিশাল বাড়ি। এখন এ বাড়ির বেশ কিছু অংশ আর ব্যবহার করা হয় না।

বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে একটা সরু রাস্তা ঢুকে গেছে। একটাই গাড়ি শুধু সে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে। উল্টোদিক থেকে কোনও গাড়ি এলে বেশ মুশকিল হতো। তা সেটা হয়নি। খানিকটা যেতে বাড়িটা বাঁদিকে পড়ল।

একটা ভারী লোহার গেট। আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই। গেটের পরে বাগানের মধ্যে দিয়ে সুরকি ফেলা রাস্তা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। বাগানের ঘাস কিছুটা বড় হয়ে গেছে। দূরের দিকে বেশ কিছু আগাছা দেখা যাচ্ছে, যা প্রমাণ করছে বাড়ির মালিক গত কিছুদিন এদিকে নজর দেওয়ার সময় পাননি।

বাড়ির বিশাল বিশাল কাচের জানলায় লাল পরদা ঝুলছে।

বাড়ির বাইরে কলিংবেল বাজাতে একজন ছোটখাটো চেহারার জাপানি লোক বেরিয়ে এল। মার্ক পরিচয় করে দিল—হারু। প্রায় তিরিশ বছর ধরে আসাহির বাড়ির সব দেখাশোনা হারুই করে।

—হারু?—সে তো বাঙালি নাম?—তন্ময় বলে উঠল।

—জাপানিদের মধ্যেও হারু খুব কমন নাম। তা যা বলছিলাম—

স্বাভাবিক ভাবে হারু আসাহির হঠাৎ মৃত্যুর খবরে বিধ্বস্ত। চোখে মুখে একটা গভীর বিষাদের ছাপ। আমাকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে জাপানি কায়দায় অভিবাদন করে ভেতরে আসতে বলল।

আমি আর মার্ক বাড়ির ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম। হারু এসে মাঝে একবার কখন ডিনার করব তা জেনে আবার চলে গেল।

মার্ককে জিগ্যেস করলাম,—হিরোসি কোথায়?

মার্ক চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল,—ও একলা থাকতে ভালোবাসে। ডাকলে সামনে আসে। বাড়ির পিছন দিকে একটা বড় বাগান আছে। ও ওখানে অনেকটা সময় কাটায়। চুপ করে বসে পাখির ডাক শোনে। তবে এখন তো রাত হয়ে গেছে। হয়তো ঘরেই আছে।

—তা আপনার কী মনে হয় ও যথেষ্ট বুদ্ধিমান? অন্য রোবটদের থেকে আলাদা?

—অবশ্যই একদম আলাদা। খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখে ফেলে। আমি এরকম কোনও রোবট আগে দেখিনি। আসলে প্রফেসারের মতো মেশিন লারনিং-এর বিষয়ে সারা বিশ্বে আর কারুর এত দখল নেই। তা ছাড়া, অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারেন। তা না হলে এরকম রোবট করা অসম্ভব হতো।

—তা আপনার কী মনে হয় প্রফেসারের মৃত্যু হিরোসির উপরে কোনও প্রভাব ফেলবে?

—জানি না। আমার তো মনে হয় করবে না। রোবটের কাছে আর মৃত্যু কী? ও তো তার অর্থই বোঝে না। তবে আপাতত ওকে একটু এড়িয়ে চলাই ভালো।

—কেন?

একটু দ্বিধা করে মার্ক বলে উঠল,—সত্যি কথাটা তাহলে বলেই ফেলি। ওকে আমরা—এমনকী প্রফেসারও ভালো করে বুঝতেন কিনা এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ নিয়েও সন্দেহ আছে, যে ওকে আমরা যতটা ইনোসেন্ট ভাবি, ততটা ইনোসেন্ট ও সত্যি কিনা। প্রফেসার আপনাকে কি এখানকার তিনটে ছেলের কথা বলেছেন? ও তাদের সঙ্গে কয়েকদিন খেলতে গিয়েছিল।

আমার ডায়েরি পাওয়ার কথাটা আর বললাম না। জিগ্যেস করলাম—কাদের কথা বলছেন?

—প্রফেসার হিরোসিকে নিয়ে কাছের একটা মাঠে যেতেন। এখানকার বছর চোদ্দো-পনেরোর কয়েকটা ছেলে ওখানে ক্রিকেট খেলতে যেত। আসলে বাইরের লোকেদের সঙ্গে কীভাবে মেশে সেটা দেখার জন্যই প্রফেসার এভাবে মেশার সুযোগ করে দেন। হিরোসি ওদের সঙ্গে খেলত। শুনেছি ওরা হিরোসির সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করত না। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ একদিন ওরা তিনজনেই হারিয়ে যায়। এটা দিন পনেরো আগের ঘটনা। তাদের আর কোনওরকম খোঁজ পাওয়া যায়নি।

—মানে? আপনি বলছেন এর সঙ্গে হিরোসি যুক্ত আছে?

চুপ করে রইল মার্ক। একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার খুব আস্তে আস্তে বলে উঠল,—আমি আরেকজনকেও জানি যে রাতারাতি এরকম উধাও হয়ে গেছে। নাম ডেভিড বোল্টন। কিছুদিন আগে এখানে প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমি তাকে খানিকটা চিনতাম। সামান্য আলাপ ছিল। এখানে একদিন ছিল। কিন্তু সকালে এ বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। সে আর বাড়ি ফিরে যায়নি।

—তা এসব নিয়ে হইচই হয়নি?

—মিসিং পারসন ডায়েরি হয়েছে। কিন্তু বডি বা কোনও ফরেনসিক ক্লু পাওয়া যায়নি। তাই সবার এখনও ধারণা হয়তো কোথাও গেছে, আবার কোনওদিন ফিরে আসবে। বডি না পাওয়া গেলে তো মার্ডার হয় না। আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলে। যদ্দুর জানি সে লোকটাকেও হিরোসির পছন্দ হয়নি।

এতটা বলে মার্ক উঠে দাঁড়াল।—আমি সেই যে সকাল চারটেতে এই খবর পেয়েছি, তার পরে আর ঘুম হয়নি। এবার উঠি। আমার বাড়ি আবার এখান থেকে প্রায় মিনিট পনেরোর রাস্তা।

—তা আপনি তো এখানেই থেকে যেতে পারেন আজকের রাতটা।

মার্ক ঠোঁট উলটে বলে উঠল,—আই অ্যাম নট দ্যাট ক্রেজি। সব মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু ওই রোবটকে নয়।—বলে আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকাল মার্ক।

—তা ওকে নিয়ে কী করার প্ল্যান আছে?

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে উঠল মার্ক—আমি ইতিমধ্যে ওর ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি। একটা সায়েন্স ল্যাব থেকে পরশু আসবে ওকে নিয়ে যেতে। ওর মতো এত বুদ্ধিমান একটা রোবটকে স্বাধীন ভাবে চলতে ফিরতে দেওয়া যায় না।—এটুকু বলে মার্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদে জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম ওর কালো জাগুয়ার গাড়িটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

—তুমি থেকে গেলে অনিলিখাদি?—একটুও ভয় লাগল না?

—ভয় হয়নি, তবে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বাড়িটা এত পুরনো যে চারদিক থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সঙ্গে একটা থমথমে পরিবেশ। তার মধ্যে আসাহি সবে মারা গেছেন। সঙ্গী ওরকম একটা রোবট যাকে তখনও দেখিনি। তবে কৌতূহল হচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি। এরকম একটা রোবট না দেখেই চলে যাব। তাও আবার যেখানে চার-চারজন রাতারাতি উধাও, সেসব রহস্য না উদ্ধার করে!

খানিক থেমে আবার শুরু করল অনিলিখাদি।

৫

হারু আমাকে আমার রাতে থাকার ঘর দেখিয়ে দিল। একতলাতেই বেশ বড় ঘর। ওখানে জিনিস পত্র রেখে জামা কাপড় বদলে ড্রয়িং রুমে ফিরে এলাম।

ড্রয়িং রুমের একদিকে দারুণ একটা ফায়ারপ্লেস। পুরোনো দিনের কাঠের উপরে কাজ করা। তাকে ঘিরে তিনটে বড় বড় সোফা। ঘরের মধ্যে দুটো মার্বেলের মূর্তি। কয়েকটা ছোট টেবিলের উপরে মোমবাতি রাখা। ঘরে আলো বেশ কম। দূরে জানলার কাছে একটা পড়ার চেয়ার টেবিল। তার উপরে একটা ল্যাম্প রাখা। পাশে বড় বুককেস। বই পড়তে হলে ওই টেবিলটা ব্যবহার করা হয়। ইচ্ছে করেই যেন পুরনো বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে ঘরে এই আলো আঁধারির পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

বুককেস থেকে সুসান মিলারের একটা ভূতের গল্পের বই নিয়ে ড্রয়িং রুমে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে পড়তে শুরু করলাম। এইরকম পরিবেশে এ ধরনের বই পড়ার মজাই আলাদা। খানিকবাদে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ হারু এসে আমাকে ডিনারে ডাকল।

দুটো ঘর পরেই ডাইনিং রুম। বিশাল লম্বা একটা ওভাল শেপের কাঠের টেবিলের একপ্রান্তে একা বসে খেলাম। হারু কিছুতেই আমার সঙ্গে বসল না। ও আগেই খেয়ে নিয়েছে। ও খুব একটা ভালো ইংরেজি বলতে পারে না। শুনলাম গত তিরিশ বছর হারু প্রফেসারের সঙ্গেই ছিল। অক্সফোর্ড থেকে আসাহি যখন এখানে আসেন, তখন একই সঙ্গে হারুও আসে। বুঝলাম ওর মন আজ খুব খারাপ। তাই বিশেষ কথা বলছিল না।

খাওয়ার পরে হারু আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা কথা বলতে গিয়ে আর বলল না। মুখে একটা দুঃখের ছাপ।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম হিরোসির সঙ্গে আজ রাতে দেখা করতে পারি কিনা। রাত তখন প্রায় এগারোটা। তবে রোবটের আবার রাত কী!

হারু বলল ওই হিরোসিকে ডেকে নিয়ে আসবে ড্রয়িং রুমে। ওখানেই অপেক্ষা করতে।

ড্রয়িংরুমে বসে না থেকে আমি লবির দু'ধারে দেওয়ালে লাগানো ছবিগুলো দেখতে থাকলাম। ড্রয়িং রুমের সামনে দিয়ে লম্বা করিডর। বেশ চওড়া। লবি দিয়ে খানিকটা এগোলে একটা জায়গায় সেটা বেশ চওড়া হয়ে গেছে। সেখান থেকে দোতলা যাওয়ার ঘোরানো সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে।

করিডরের দেওয়ালে লাগানো ল্যাম্পের মৃদু আলোয় শুধু ছবিগুলোই যেন চারদিকের অন্ধকারে ধরা দিয়েছে। ছবির ফ্রেমগুলো তাতে চকচক করছে।

ছবিগুলো বেশির ভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে হিরোসিমা আর নাগাসাকির বেশ কিছু ছবি তার মধ্যে আছে। জানি না এই ধ্বংসস্তূপ আর মৃতদেহের ছবি আসাহি কেন এখানে সাজিয়ে রেখেছেন। আসাহির যে ইতিহাসে বেশ আগ্রহ ছিল তা বেশ বোঝা যায়। ড্রয়িং রুমে ফের ফিরে এলাম।

অনেক রাত হয়ে গেছে। কিন্তু হিরোসির আর দেখা নেই। শুতে যাব কিনা ভাবছি, এর মধ্যে পায়ের শব্দ পেলাম। প্রথমে হারু ঢুকল, তার পরে একটা বাচ্চা ছেলে। হিরোসি।

আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল ছেলেটা। ছেলেটার রঙ বেশ ফরসা, গোলাপি একটা আভা যেন বেরোচ্ছে গা দিয়ে। জাপানি বাচ্চাদের মতো দেখতে। ছোট ছোট কুতকুতে চোখ। মুখে একটা অদ্ভুত সারল্য। ছেলেটার চোখে নীল মনি। এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমাকে সবরকমভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছে।

দেখে চট করে বোঝার উপায় নেই যে সে রোবট। শুধু হাত-পা চালানোর মধ্যে একটু যা আড়ষ্টতা।

আমার দিকে আস্তে করে হাত বাড়িয়ে বলে উঠল ও,—ওয়েলকাম অনিলিখা। মাই নেম ইস হিরোসি। আঠেরোটা ভাষার মধ্যে আমি বাংলাও জানি। —বলে আমার সঙ্গে দিব্বি বাংলায় কথা বলতে শুরু করল।

একটু কথা বলেই বুঝলাম। ও বাংলা শুধু ভালো বোঝে না, বেশ ভালো বলেও। শুধু মাঝে মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ করে ফেলে সাধু ও চলিত ভাষা মিলে। কিছু কথা কীরকম হল তা বলি।

—কেমন আছ হিরোসি?

—অন্যদিন যেরকম থাকি, সেরকমই ভালো।

—তোমার কী করতে সবথেকে ভালো লাগে?

—এমন কিছু করিতে যা আগে করি নাই।

—আজ সেরকম কী করলে?

—চারটে নতুন বই পড়েছি। গাছে একটা নতুন ধরনের নাম না জানা কৃষ্ণকায় পক্ষী দেখেছি। আর একটা কাজ করেছি, যেটা বলিতে আমি বাধ্য নই।

—কেন?

—নিজের সুরক্ষার জন্য।

সত্যি বলতে কী এরকমভাবে একটা বাচ্চা ছেলে কথা বলবে ভাবতে পারিনি। বুঝলাম যতই বুদ্ধিমান রোবট হোক না কেন কমনসেন্সের অভাব আছে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যরা ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে।

আমাকে জিগ্যেস করে উঠল,—তা তুমি কোথা থেকে আসছ?

বললাম,—ভারত।

—ভারত খুব ভালো দেশ। কখনও অন্য কোনও দেশকে আক্রমণ করেনি। ভারতবাসীরা সবাইকে খুব সহজে আপনার করে নেয়।

হঠাৎ মনে হল ছেলেটাকে একটু শক্ত প্রশ্ন করি। বলে উঠলাম,—তুমি নিজেকে কোন দেশের মনে করো?

—জাপানের। যেভাবে দ্বিধাহীন ভাবে বলে উঠল, তাতে অবাক হলাম।

প্রফেসার যেরকম লিখেছিলেন, ছেলেটার কথাগুলো একটু ধারালো, কিছু কথা কানে লাগে। তবে মুখে-চোখে একটা অদ্ভুত সারল্য। ভুলেই যেতে হয় যে ও মানুষ নয়। অনেক সময় মানুষ ভেবে ওর কাছ থেকে সেরকম ব্যবহার পাব, এই ভুলও করে ফেলা সম্ভব।

খানিকবাদে আমি চুপ করে আছি দেখে ও হঠাৎ শিশুর সারল্যে বলে উঠল,—বাইরের গগন দেখবে?

—হ্যাঁ, চলো।

ওর পিছন পিছন বাইরে বাগানে বেরিয়ে এলাম। আর আসতেই একটা স্নিগ্ধ ঠান্ডা হাওয়া আমাকে স্পর্শ করে গেল। বাইরের উষ্ণতা এগারো-বারো ডিগ্রি হবে। হাওয়া দিলে বেশ ঠান্ডা লাগে। বেশ বড় বাগান। বাড়িটা পাহাড়ের একদম উপরের দিকে। তাই বাগান থেকে নীচে দূরের লেকটা পরিষ্কার দেখা যায়। উপরে তারায় ভরা আকাশ। এরকম দৃশ্য চট করে দেখার সুযোগ পাওয়া যায় না। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম।

খানিকবাদে একটু ঝিরঝির করে আলতো বৃষ্টি শুরু হল। সূক্ষ্ম জলের কণা মাকড়সার জালের মতো সারা শরীরকে যেন অস্পষ্টভাবে স্পর্শ করল। একটা বড় গারডেন আম্ব্রেলার তলায় এসে বসলাম। দূরে চার্চের মাথা দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পাইনের গাছের সারি রাতের আলোয় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি আর হাওয়ার খেলা দেখছে। মাঝেমধ্যে আশেপাশের গাছে পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

নীচে বাড়ি, উপত্যকা সব মাঝেমধ্যে মেঘের চাদরে ঢেকে যাচ্ছে। আবার চাদরের বাইরে আসছে, ফের হারিয়ে যাচ্ছে।

এসব মুগ্ধ হয়ে দেখছি, এমন সময় পাশ থেকে হিরোসি বলল,—তুমি অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি কোনটা দেখাও তো?

আমি ভালো করে চারদিক দেখে চিহ্নিত করলাম।

ঠিক।—বলে আবার জিগ্যেস করে উঠল,—'ওরিয়ন নেবুলা' কোনটা দেখাও তো!

আবার দেখালাম।

ও দেখলাম শিশুর আনন্দে বলে উঠল,—ঠিক বলেছ। আমি আরও দশটা প্রশ্ন করব। সাতের বেশি পারলে পাস। না হলে ফেল।

—তা পাস করলে তুমি আমাকে কী দেবে?—বলে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল,—আর ফেল করলে তুমি কী দেবে?

হেসে বলে উঠলাম,—তোমার পছন্দমতো একটা গল্প পড়ে দেব।

ও যে গল্প শুনতে ভালোবাসে এরকম একটা ধারণা আসাহির ডায়েরি পড়ে আমার তৈরি হয়েছিল। দেখলাম বাচ্চাদের মতোই এককথায় রাজি হয়ে গেল।

আবার আমার আগের প্রশ্নটা করলাম,—তা তুমি কী দেবে বললে না তো?

পাশের ম্যাগনোলিয়া গাছটাকে দেখিয়ে ও বলে উঠল,—ওর থেকে একটা ফুল তুলে দেব।

ইচ্ছে করেই ঠিক ছটা সঠিক, আর চারটে ভুল উত্তর দিলাম যাতে ওকে একটা গল্প পড়ে শোনানোর সুযোগ হয়।

আমার ফোন থেকে পড়ে শোনালাম সত্যজিৎ রায়ের 'স্ফিংস'। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল। শুনে খুব খুশি।

গল্প শুনে ঠিক গুনে গুনে চারটে প্রশ্ন করল। সব কটা প্রশ্নর উত্তর অবশ্য আমার দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এরপর আমাকে ও একটা ভারি সুন্দর ম্যাগনোলিয়া ফুল দিল।

ছেলেটার সঙ্গে আরও মিনিট পাঁচেক কথা বললাম। এটুকু বুঝেছিলাম, যে ওকে দেখে ওর বয়সি কোনও বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে। ওর বুদ্ধি অনেক বেশি। ভয় বলে কিছু নেই। তাই কথার মধ্যেও কোনও দ্বিধা নেই।

তবে সবথেকে বড় কথা ওর একটা নিজস্ব অনুভূতির জগত আছে যেখানে ও ফুলের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে। নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করতেও দ্বিধা করে না। ঠিক যেমন আমি প্রশ্নের উত্তর না পারা সত্বেও ও শর্ত ভেঙে শেষে আমাকে একটা ফুল এনে দিল।

একটা জিনিস ভাবতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল, যে এই ছেলেটাই কোনও ধরনের অপরাধ করে থাকতে পারে। আসাহি হয়তো ঠিকই বলেছেন ও সত্যিই শান্তির দূত। আমরাই হয়তো ওকে বুঝতে ভুল করছি। অহেতুক হিরোসির ওরকম কথাবার্তা-হাবভাবের জন্য সন্দেহ করছি।

৬

রাত তখন একটা বাজে। হঠাৎ ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। আমার নাম্বারটা ওখানে খুব কম জনের কাছে ছিল। তাই হঠাৎ করে এত রাতে ফোন পেয়ে খুব অবাক হলাম। দেখি মার্কের ফোন।

—অনিলিখা! তুমি কোথায়?—মার্কের গলায় একটা ভয়ের সুর।

প্রশ্নটা শুনে অবাক হলাম,—আমি শুয়েছি। একতলার গেস্ট রুমে। এত রাতে? কোনও অসুবিধে হয়েছে?

—তোমাকে একটা খুব দরকারি খবর দিই। হাসপাতাল থেকে এখনই ফোন করেছিল। পোস্ট মরটেম রিপোর্টে ওরা প্রফেসারের শরীরে 'অ্যাকোনাইট' বিষ পেয়েছে। তার জন্যই বোধহয় হার্টঅ্যাটাক হয়েছে। অ্যাকোনাইট পয়জনিং-এ একরকম হতে পারে, জানো নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, তা জানি। রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসকেও তো খাবারে অ্যাকোনাইট মিশিয়ে মারা হয়েছিল।

—ঠিক তাই। আমার মনে হয় প্রফেসারের খাবারেও অ্যাকোনাইট মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বুঝতেই পারছ কে করেছে!

—হিরোসি? কিন্তু ও করবে কেন?

—সেটা বলা শক্ত। তবে ও ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে না। বুঝতেই পারছ, ও যখন ওর স্রষ্টাকে ঠান্ডা মাথায় মেরেছে, তখন এখানেই ওর কাজ শেষ হবে না। আমি নিশ্চিত প্রফেসার ওর কুকর্মের কথা জানতে পেরেছিলেন। ওই যে ছেলে তিনটে হারিয়ে গিয়েছিল, তাদের যে ওর হাতেই মরতে হয়েছে, সে কথা জানতে পেরেছিলেন হয়তো। আর তাই প্রফেসারকে ও হত্যা করেছে।—একটু থেমে মার্ক ফের বলে উঠল,—আমি কি এখনই আসব তোমাকে নিতে? আমার মনে হয় না তোমার ওখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত।

—না না, তার কোনও দরকার নেই। কাল সকালেই তো এখান থেকে চলে যাব।

—কিন্তু এখন আর সকাল হওয়ার মধ্যে অনেকটা সময় বাকি।

—আমি যথেষ্ট সতর্ক থাকব। আশা করি, সেরকম কিছু হলে নিজেকে রক্ষা করতে পারব। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। তবে আমাকে জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ফোন ছেড়ে দিলাম। তাহলে কি এর জন্যেই গতকাল আসাহিকে এত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল! উনি কি জানতে পেরে গিয়েছিলেন হিরোসির অপকর্মের কথা? আর তাই?

ভয় পেলে অনেক কিছুতেই ভয় পাওয়া যায়। কিন্তু রহস্য সব কিছুতে থাকে না। যত সময় যাচ্ছিল, হিরোসিকে নিয়ে একটা অদম্য কৌতূহল তৈরি হচ্ছিল। একইসঙ্গে ওই তিনটে ছেলে কোথায় গেল সেটাও

জানা দরকার। কোথাও আটকে রাখেনি তো? যদি ওদের হত্যা করে থাকে, তাহলে এই বাড়িতেই ওদের ডেডবডি থাকার বড় সম্ভাবনা। প্রথমবারের জন্য একটা ভয়ের শিরশিরানি অনুভব করলাম।

আজ রাতেই সময়-সুযোগ মতো বেরিয়ে খোঁজ নিতে হবে।

৭

তখন রাত তিনটে হবে। বাইরে উষ্ণতা দশ—এগারো ডিগ্রি হবে। ঘরে ফায়ারপ্লেস চলছে। তার আলোয় চঞ্চল ছায়াগুলো ঘরময় ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। খেয়াল করলাম কোথাও যেন কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে। আমার চেনা সুর। রবীন্দ্রসঙ্গীত। বুঝলাম আর কেউ নয়, হিরোসি বাজাচ্ছে। আসাহি হিরোসির এই পিয়ানো বাজানোতে আগ্রহের কথা ডায়েরিতে একজায়গায় উল্লেখ করেছিলেন। এই আমার সুযোগ। আমি বুঝতে পারছি হিরোসি কোথায় আছে। সে সুযোগে অন্য ঘরগুলো দেখে নিতে পারব।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। একবার পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখা দরকার। আওয়াজটা তিনতলা থেকে আসছে। ঠিক করলাম দোতলা দিয়ে শুরু করব। এক এক করে দোতলার ঘরগুলো দেখা দরকার যদি ওই ছেলেগুলোর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়। দেওয়ালে লাগানো ক্ষীণ আলোয় সিঁড়ির অন্ধকার পুরোটা কাটেনি। সিঁড়ির উপরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে টের পাব না। তাই সন্তর্পণে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকলাম।

একটু উঠে থেমে গেলাম। পিয়ানোর শব্দ যেন একবার থেমে গেল। উপরের ঘরে পায়ের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম। খানিকবাদে সে পায়ের শব্দ থেমে গেল। আবার পিয়ানো শুরু হল। আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত। বুঝলাম আসাহির থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা পেয়েছে হিরোসি। তিনতলা থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে। এ গানটা আসাহির ফেভারিট ছিল।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।।
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়—
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।।

এই নিঝুম রাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই সুর পুরো ম্যানসনে এমন এক অপার্থিব পরিবেশ তৈরি করেছে, যে তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই।

কিন্তু এর একটা পার্থিব মানে হল, এখনও হিরোসি তিন তলায় আছে।

সতর্ক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে আবার আস্তে আস্তে উঠলাম। দোতলায়। কালির মতো অন্ধকার দোতলা জুড়ে। বাইরে এখন জোরে হাওয়া দিচ্ছে। শন শন শব্দ আসছে মাঝেমধ্যে। বড় বড় কাচের জানলাগুলো থরথর করে কাঁপছে।

দোতলায় অনেকগুলো ঘর। সব ঘরের দরজা ভেজানো। আস্তে আস্তে একটা ঘরের দরজার নব ঘুরিয়ে ঢুকলাম। বিশাল ঘর। নীচে পাইন কাঠের ফ্লোরিং। আসবাব নেই। একটা চেয়ার, একটা বুক কেস। দেওয়ালে ঝোলানো মোমদানিতে একটা মোমবাতি শুধু জ্বলছে।

ঘরের পরিবেশ ঠিক আগের দিনের মতোই ধরে রাখা হয়েছে। আসাহি যে এ ধরনের পুরনো বাড়ির পরিবেশ পছন্দ করতেন তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আসলে এই বাড়িগুলোর একটা নিজস্ব চরিত্র থাকে, যেটা নতুন বাড়িতে থাকে না। একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারি ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। ঘরে ঢুকে দরজা আবার টেনে বন্ধ করে দিলাম। ঘরের ভেতর দিকটা

বেশ অন্ধকার। হঠাৎ কোনও একটা খোলা জানলার হাওয়ায় মোমবাতির আলো কেঁপে উঠে নিভে গেল। এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলাম। মনে হয়েছিল হিরোসি এ ঘরে চলে এসেছে আর এসেই যেন মোমবাতির আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

অন্ধকারেই দেওয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেলাম। ও আসেনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরে ফোনের আলো জ্বেলে যতটা সম্ভব ভালো করে দেখলাম। ঘরের শেষ প্রান্ত অব্দি গিয়েও সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলাম না।

আবার বেরিয়ে এসে পাশের ঘরে সন্তর্পণে ঢুকলাম। প্রায় একই অভিজ্ঞতা। শুধু এ ঘরে আরও অন্য ধরনের কিছু আসবাব আছে। দেওয়ালে বেশ কিছু অয়েল পেন্টিং আছে। কেউ নেই।

পরপর দোতলার সব ক'টা ঘর ঘুরে দেখলাম। প্রত্যেকটা যেন আগেরটা থেকে আরও নিস্তব্ধ। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পেলাম না।

তিনতলায় ঠিক করলাম পরে যাব। এখনও পিয়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার উপস্থিতি টের পেলে মুশকিল। তার আগে আবার একতলার সবকটা ঘর ভালো করে দেখা দরকার।

প্রফেসারের স্টাডি রুম, হারুর ঘর সব একতলায়। সাবধানে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম। নীচে নামার পরে লবি। লবির একদিকে ড্রয়িংরুম, আমার থাকার ঘর, ডাইনিং রুম ইত্যাদি। অন্য দিকে শুনেছিলাম প্রফেসারের স্টাডি রুম। ওই দিকটায় যাওয়া হয়নি।

আস্তে আস্তে স্টাডি রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। একটা ভারী কাঠের দরজা জোরে ঠেলতে খুলে গেল। বেশ বড় স্টাডি রুম। ঘরের দু'দিক দিয়ে বইঠাসা সিলিং অব্দি কাঠের আলমারি। ঘরের এক দিক জুড়ে কাচের জানলা।

জানলার কাছে একটা পড়ার টেবিল। তার উপরে ল্যাপটপ রাখা। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বাললাম। ঘরের মধ্যে দুটো ঝাড় লণ্ঠন। আলমারির বইগুলোর উপর চোখ বোলাতেই বুঝলাম প্রফেসারের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ ছিল। কোনওটা গাছ নিয়ে তো কোনওটা অঙ্কের উপরে, কোনওটা বা পেন্টিং-এর ইতিহাসের উপরে। প্রায় সব রকমের বই-এর অদ্ভুত কালেকশান। তবে একটা বিষয়ের উপরে বেশ কিছু বই দেখলাম। দেখে একটু অবাকই হলাম। 'সিক্রেট এজেন্টস বেডসাইড রিডার'-জাতীয় বই। বেশ কিছু বই MI6-এর উপরে।

—MI6 কী অনিলিখাদি?—সহেলী বলে উঠল।

—MI6 হল ইংল্যান্ডের সিক্রেট সারভিস। যেমন আমেরিকার CIA. রাশিয়ার KGB। তবে MI6 আরও অনেক পুরনো। ইম্পেরিয়াল জার্মানির বিরুদ্ধে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ১৯০৯ সালে MI6 তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের চোখের সামনেই এরকম অনেক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট থাকে যাদের আমরা চিনতে পারি না। জেমস বন্ড চরিত্রটা তো এরকমই এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট—সিডনি রেলির অনুসরণে তৈরি হয়।

সিডনি সাত সাতটা ভাষা খুব ভালো জানতেন। বিভিন্ন ধরনের ছদ্মবেশ নিতে পারতেন। শোনা যায় চারটে দেশের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিও করেছিলেন। লেনিনকে মারার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তা এরকম অনেক বিখ্যাত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের কথা শোনা যায়, যাদের কোনওভাবেই সাধারণের থেকে আলাদা করা যায় না। অথচ এরাই হল সরকারের চোখ-কান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান এনিগমা মেশিনের কোড ব্রেক তো MI6-ই করেছিল। ইনফ্যাক্ট ব্লেচলী পার্কের কোড ব্রেকিং-এর দলে আমেরিকান কিছু কোড ব্রেকারও যোগ দেয়। এদের মধ্যে অংকের বিশেষজ্ঞ, দাবাড়ু, পাজল সলভার সবাই ছিল। এক সময় ভাবা হতো যে এনিগমা মেসিনের সাংকেতিক ভাষা উদ্ধার করা অসম্ভব। কিন্তু MI6-র কোড ব্রেকাররা এটা সম্ভব করেছিল। তার জন্যই জার্মানদের অনেক গোপন

তথ্য আদান-প্রদানের সময় ইংরেজরা আগে থেকে জেনে নিয়ে বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘোরাতে পেরেছিল। বলা হয় তা না হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরও অন্তত দু-বছর ধরে চলত।

তা যা বলছিলাম অন্যান্য অনেক বই-এর সঙ্গে এরকম কিছু বইও আছে যার বিষয় MI6-এর অপারেশন। বইগুলো সহজলভ্য বইও নয়। এবিষয়ে ওর আগ্রহ ছিল একথা উনি আমাকে কোনওদিন বলেননি।

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকটা হিরোশিমার পারমাণবিক বোমার উপরে লেখা বই। একটা নোটবুকও পেলাম। ওঁর নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতার উপরে লেখা।

জানি এরকম না বলে পড়াটা অনধিকার চর্চার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু তবু দু-একটা লাইন পড়ে আগ্রহ সামলাতে পারলাম না। এটা ১৯৪৫-এর বেশ কয়েকবছর পরের লেখা। সেটা লেখার ধরন দেখেই বোঝা যায়। তার খানিক অংশ আমি ওঁর ডায়েরিতেই পড়েছি। তবে এখানে অনেক বেশি ডিটেলসে লেখা আছে।

লিখেছেন—

ওঁদের প্রথম ধারণা হয়েছিল বাড়ির সামনেই কোনও বোমা পড়েছে। কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখেন শুধু ওঁদের বাড়ি নয় সামনে যতদূর দেখা যায় প্রায় সব বাড়ি ভেঙে গেছে। ওঁকে নিয়ে ওঁর বাবা প্রথমে বাড়ির থেকে কিছু দূরে এক নদীতে নিয়ে যায়। ওঁর সেই দৃশ্য পরিষ্কার মনে আছে। অনেক লোক অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ওই নদীর জলে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এই হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া উষ্ণতা আর তাপপ্রবাহের থেকে রেহাই পেতে। জল খেতে।

ওঁরা তারপরে হাসপাতালে যায়। মা হাসপাতালে যাওয়ার খানিকক্ষণের মধ্যে মারা যায়। মা'র মৃত্যুর সময়েও ওঁর হাত ছিল মা'র হাতের মুঠোর মধ্যে। মা'র শরীরের বেশ কিছু জায়গায় খুব গভীরভাবে কাঁচ ঢুকে গিয়েছিল। ইন্টারনাল ব্লিডিং এর জন্য মৃত্যু হয়।

বাবারও রক্তবমি শুরু হয় দু'দিন বাদে। মারা যান পাঁচদিন বাদে। পরে শুনেছিল ওই কালো রেডিও অ্যাক্টিভ বৃষ্টির জল খাওয়া ওঁদের একেবারে উচিত হয়নি। নিজে কীভাবে ক্যান্সারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, সেটাই আশ্চর্য।

এর কয়েকমাস পরে একটু সুস্থ হয়ে উঠলে ওঁকে ওঁর কাকা টোকিও নিয়ে আসে। তার কাছেই আসাহি মানুষ। কিন্তু ডায়েরির লেখা পড়লেই বোঝা যায় হঠাৎ করে সবাইকে হারানোর বেদনা ওঁর মনে খুব গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল।

উনি তাই মাঝে মধ্যেই ছুটে যেতেন হিরোসিমায়। ওঁর বাড়ির জায়গায় এখন একটা বড় রেস্টুরেন্ট হয়েছে। তবু ওখানে গেলেই আজও যেন উনি সেই শৈশবের দিনগুলো ফিরে পান। মনে হয় সবাই আছে। ছোটবেলার মুহূর্তগুলো যেন ক্ষণিকের জন্য জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়।

এতক্ষণ বাদে অনিলিখাদি একটু থেমে ফের বলে উঠল,—আমি সামান্য কিছু পাতা পড়েছিলাম। পড়ে একটা কথাই আমার মনে হয়েছিল আসাহি যেন আমেরিকা আর ইংল্যান্ডকে কোনওদিনের জন্য ক্ষমা করতে পারেনি। সেই সুরটা খুব প্রকটভাবে ফুটে উঠেছিল ওঁর লেখার মধ্যে।

আরও চোখে পড়ার মতো ওঁর সংগ্রহে রাখা ছবিগুলো। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করা বোমা বিস্ফোরণের আগে আর পরের ছবি।

এটা সত্যি যে আমারও মনে হয় কীভাবে জাপান এত বড় দুটো পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরেও আমেরিকা ও সেই সময়কার অ্যালায়েন্স পাওয়ারকে ক্ষমা করেছে, সেটাই আশ্চর্য। আসাহির এই অনুভূতি নিশ্চয়ই শুধু ওঁর একার নয়। যেখানে চারলক্ষের মতো জনসংখ্যা ছিল হিরোশিমার, তার প্রায় চারভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক লক্ষ লোক মারা যায় ওই পরমাণু বোমায়। তার বাইরে ওই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব ছিল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। তার জন্য যে কত লোক মারা গেছে, কষ্ট পেয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

আমার মনের মধ্যে একটা অন্য ধরনের চিন্তা ভাবনা ঘুরে ফিরে আসছিল এ সব দেখার পরে। এত কিছুর পরেও আসাহি কেন ইংল্যান্ডে এতদিন ছিলেন এই ঘৃণাকে মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে?

৮

ওই ঘর থেকে আমি বেরিয়ে আসি। অন্য ঘরগুলো এক এক করে দেখা শুরু করি। যত সময় যাচ্ছিল, কেন জানি না একটা অজানা ভয় আমাকে গ্রাস করছিল। কিছু একটা যেন আমাকে থামতে বলছিল। মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে ফলো করছে। কেউ যেন ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছিল। মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলাম। কেউ নেই। তবু ওই ভয়ের কারণ সে মুহূর্তে আমার অজানা ছিল।

আমি শেষ পর্যন্ত সব ক'টা ঘর ভালো করে না দেখে থামতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমিই একমাত্র যে ওই ছেলেগুলোকে এখনও বাঁচাতে পারি। ওরা যেন আমার সাহায্য চাইছে। আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

কিন্তু কিছু পেলাম না। একতলার সবক'টা ঘর দেখে প্রায় ফিরেই আসছিলাম। লবির একদম শেষ দিকে ডানদিকে একটা নীচু দরজা দেওয়া ঘর। ভারী কাঠের দরজায় বাইরে থেকে কাঠের হুড়কো টানা। মনে হয় আগে এটা একটা সময় স্টোরেজ রুম হিসেবে ব্যবহার করা হত। ওর ভেতরে উঁকি মেরে কিছু না দেখে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ মনে হল কোনও কিছু লুকোনোর জন্য এটা খুব ভালো জায়গা হতে পারে।

ঘরের ভেতরের দিকে এগোলাম। পুরোনো বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে একটা নিজস্ব প্রাণ থাকে। ফেলে আসা সময়ের পায়ের আওয়াজ যেন তাতে ধরা থাকে। একটা সুপ্ত আওয়াজ থাকে। তারা তাদের মতো করে কথা বলে। বাকি সব ঘরেই সে পরিচয় ছিল। শুধু এ ঘরটায় যেন সে প্রাণ ছিল না। এ ঘরের সিলিং বেশ নীচু। পাঁচ ফুটের মতো একদিকে। ঘরটার ছাদ উলটো দিকের দেওয়ালের দিকে ক্রমশ আরও নীচু হয়ে গেছে। সেখানে সিলিং—এর হাইট তিন ফুটের মতো।

মনে হয় এ ঘরটাতে হিরোসি মাঝে মধ্যে এসে বসে। বিভিন্ন বাচ্চাদের বই ছড়ানো। তার মধ্যে প্রফেসার স্টুয়ারটের 'ক্যাবিনেট অফ ম্যাথাম্যাটিকাল কিউরিওসিটিস'—এর বইটাও আছে। এগুলো কে পড়ে? হিরোসি? অবাক ব্যাপার।

আগে খেয়াল করিনি। ঘরের শেষ দিকে যেখানে সব থেকে নীচু দেওয়াল, সেখানে একটা ছোট দরজা আছে এ ঘর থেকে অন্য আরেকটা ঘরে যাওয়ার। দরজার রঙ এমন যে প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে।

লুকনো চেম্বার?

দরজায় একটা ভারী তালা ঝুলছে। ফোনের টর্চের আলো ফেলে দরজার সেই তালা খোলার চেষ্টা করলাম। আমার কাছে আমার চুলের ক্লিপ ছিল। আমি আগে এরকম তালা অনেক ভেঙেছি। ক্লিপ সামান্য বেঁকিয়ে মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পরে এটাও খুলে ফেললাম। কিন্তু তারপরেও কাঠের পাল্লাটা এত শক্ত করে আটকানো যে খুলছিল না। বেশ খানিকক্ষণ টানাটানির পরে তবে খুলল।

আর খোলার পরেই একটা উগ্র পচা গন্ধ এসে যেন আমাকে ধাক্কা দিল। পাশের ঘর বা প্যাসেজ যাই বলি না কেন, তা চওড়ায় তিন ফুটের বেশি নয়। কিন্তু ভেতরে অনেকটা ঢুকে গেছে। ফোনের ক্ষীণ আলোয় তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু কিছুটা দূরে একটা মরা বেড়াল চোখে পড়ল। এটা কি বাড়ির পোষা বেড়াল পিটারের মৃতদেহ?

ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে। কিন্তু সেটা কি এখন ঠিক হবে? হিরোসি যদি টের পেয়ে যায়।

একটু দোনামনা করছি, হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে রক্ত জল হয়ে গেল। দরজা দিয়ে বাইরের যে সামান্য আলো আসছিল, তাকে খানিকটা আড়াল করে একটা সাড়ে তিনফুটের মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে। হিরোসি।

উপর থেকে যদিও পিয়ানোর আওয়াজ এখনও আসছে।

ওর মুখটা ভালো করে না দেখতে পেলেও আমি যে ওর পরবর্তী শিকার হতে চলেছি, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু যেটা হল সেটার জন্য আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। কিছু বোঝার আগেই ও হঠাৎ এ ঘরের বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। আর সেটা করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে আসা ক্ষীণ আলোর রেখা পুরোপুরি হারিয়ে গেল।

বাইরে থেকে হিরোসির গলা শুনতে পেলাম—তাহলে তুমি এখানেই থাকো অনিলিখা। তুমি অনেক সময় নিয়ে দেখতে পারবে। ওদের একটু খুঁজলেই পাবে। কিন্তু তোমাকে আর কেউ খুঁজে পাবে না। তোমাকে একটা কথা বলি—ওরা কেউ ভালো ছিল না।

—তা তুমি ওদের মারলে কেন?

—ওরাও তো আমাকে মারত। বল দিয়ে, ব্যাট দিয়ে। ভাবত আমি ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করব না।

—কিন্তু তুমি তো ওদের না মেরেও প্রতিবাদ করতে পারতে।

—ওরা আমাকে একদিন মেরে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তারপরেই আমি ওদের এক এক করে ধরে এনে মারি।

—কিন্তু তুমি কি এটা ভেবে দেখোনি, যে এর জন্য একদিন তুমি ধরা পড়বেই। তারপরে তুমি প্রফেসারকেও একদিন মেরে ফেললে?

—না, আমি প্রফেসারকে মারিনি। ওরা মেরেছে।

—কারা মেরেছে?

—মার্ক। MI6। ওই ছেলেগুলোও মার্কের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। ওরা প্রফেসারকে মারতে চেয়েছিল। তাই আমাকে বাধ্য হয়ে ওদের মারতে হয়েছে।

উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম,—ওরা কেন প্রফেসারের ক্ষতি করতে চাইবে?

—প্রফেসার শুধু বিজ্ঞানী ও প্রফেসার ছিলেন না। উনি ছিলেন জাপানের 'ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালিসিস' সার্ভিসের সদস্য। সে জন্যই উনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অনেক অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য ওঁর মাধ্যমে জাপানে চলে যেত। ওঁর মূল উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। উনি চাইতেন জাপান যেন আবার কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সেটা বুঝতে পেরে ওঁকে গোপনে মারার চেষ্টা করে। এ সব হত্যা তো আর প্রকাশ্যে হয় না। খুব সাবধানে কোনও চিহ্ন না রেখে হয়। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম শুধু ওরাই যুক্ত আছে। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে মার্কও এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

—মার্ক?

—হ্যাঁ, মার্কও ব্রিটিশ সিক্রেট সারভিস MI6-এর হয়ে কাজ করে। এখানে এসেছিল সেজন্যই। সেজন্যই প্রফেসারের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। ও কিন্তু এখন তোমাকেও সন্দেহ করে। মারতে চায়।

অবাক হচ্ছিলাম হিরোসির কথা বলার ধরন দেখে। ও কি করে এত কিছু জানল?

আমি বলে উঠলাম,—কিন্তু আমাকে এ ঘরে বন্ধ করে তোমার কী লাভ?

—তুমি বেরোলেই আমার বিপদ। আমি নিজের সুরক্ষার জন্য তোমাকে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। আমি জানি তুমি খারাপ লোক নও।

এর মধ্যে আমার ফোন বেজে উঠল। মার্কের ফোন। এখানে যে নেটওয়ার্ক আছে, এটাই বাঁচোয়া।

বাইরে থেকে হিরোসির গলা ভেসে এল,—ফোন ধরো না অনিলিখা।

আমি তবু হিরোসির কথা অগ্রাহ্য করে ফোনটা নিলাম।

মার্কের গলা—কোথায় তুমি? আমি এসে গেছি।

ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম,—আমি একতলার একটা ঘরে বন্ধ আছি। এখানে ওই তিনটে ছেলেও বোধহয় আছে। জীবিত না মৃত-তা অবশ্য জানি না। বাইরে হিরোসি আছে।

—চিন্তা করো না। আমি আসছি। পুলিসেও খবর দিয়েছি। ওরা খানিকক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে।

ফোন কেটে গেল। বাইরে বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা।

হিরোসি কি সামনে আছে? নাকি কোথাও গেছে? ও যা বলল, তা কি ঠিক? মার্ক MI6-এর হয়ে কাজ করে? আসাহি জাপানের সিক্রেট সার্ভিসের হয়ে কাজ করত? এতগুলো প্রায় অসম্ভব তথ্য। আর হিরোসি সেসব তথ্য পেল কী করে?

নাকি হিরোসি নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে দলে টানতে চাইছে? এটা কি ওর আরেকটা বানানো গল্প যাতে আমি ওকে বিশ্বাস করি?

১০

ঘরের অন্ধকার যেন আরও বাড়ছে। ফোনে চারজ বেশি নেই। তবু তার সামান্য আলোতে পাশের ঘরের ওই সরু প্যাসেজের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আবার সেই তীব্র পচা গন্ধ। কিছু দূরে বেড়ালটার মৃতদেহ পড়ে আছে। আরেকটু দূরে যেতেই চমকে উঠলাম। প্রথম দেহটা চোখে পড়ল। বয়স পনেরোর ছেলের মৃতদেহ হলেও এখন তাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে।

শরীর থেকে চামড়া খুলে খুলে পড়েছে। সারা শরীর ফুলে উঠেছে। সাদা চোখদুটো চোখের কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে। পচনের জন্য গায়ে কালো-সবুজ ছোপছোপ। দেখেই মনে হল অন্তত দিন দশেক আগে মৃত্যু হয়েছে।

আরেকটু যেতেই বাকি দুটো মৃতদেহ খুঁজে পেলাম। প্রায় একই অবস্থায়। হাত লাগতেই চামড়া খসে পড়ছে। এমন সে দৃশ্য যে গা গুলিয়ে বমি পাচ্ছিল। আর না এগিয়ে কোনওরকমে আবার হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মাথায় ঢুকছে না যে আসাহি যে রোবটকে শান্তির দূত হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে এতটা হিংস্রতা এল কী করে? নাকি আসাহির মুখে বারবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা শুনে হিরোসি ভেবেছিল শুধু হিংসাই কারো অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে!

এমারজেন্সি নাম্বারে ফোন করতে গিয়ে দেখলাম ফোনে আর নেটওয়ার্ক নেই। হিরোসি কি কিছু করেছে? কে জানে?

ঘরে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। গরম জলের পাইপের মাধ্যমে সব ঘর উষ্ণ রাখা হয়। তার জন্য একটা আওয়াজ সব ঘরে হয়। এ ঘরে সেরকম কোনও গরম করার ব্যবস্থা নেই। সেই জলের পাইপের থেকেও কোনও আওয়াজ নেই। ঘরে এতগুলো মৃতদেহের উপস্থিতি আরো যেন ঠান্ডা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। দরজা ভেতর থেকে খোলার কোনও উপায় নেই। একমাত্র উপায় মার্কের জন্য অপেক্ষা করার। হয়তো ও খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে আর আমাকে উদ্ধার করবে। দেরি হচ্ছে কেন?

হঠাৎ বাইরে একটা তীব্র চিৎকার শুনলাম। মনে হল মার্কের। তারপরই সব চুপচাপ। তাহলে কি মার্ককেও ও মেরে ফেলল।

বেশ খানিকক্ষণ ফের সম্পূর্ণ নীরবতা। সময় ক'টা হল তা বোঝার কোনও উপায় নেই। ঘরের অন্ধকার যেন আমাকে আস্তে আস্তে গিলে নিচ্ছিল। সেই পচা গন্ধটা এখন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। অক্সিজেন আস্তে আস্তে কমে আসছিল।

ভেতর থেকে দরজা খোলার অনেক চেষ্টা করলাম। খুলল না। শক্ত ওক কাঠের দরজা। উপায় না দেখে ধাক্কা দিতে শুরু করলাম। বাড়ির মধ্যে যে কেউ থাকলে টের পাবে। কিন্তু কোনও সাড়া এল না। হারুও কি ওর দলে চলে গেছে?

তাহলে কি এভাবেই আমাকে মরতে হবে?

আবার বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। ফোনের চারজ মোটে ৫% দেখাচ্ছে। আর খানিকক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তখন একমাত্র সঙ্গী হবে শুধু নীরবতা, শুধু অন্ধকার। হঠাৎ মনে হল অন্য ঘরের মধ্যে দিয়ে বাইরে যাওয়ার কোনও পথ আছে কি? খুঁজে দেখা দরকার।

আবার ফোনের টর্চের ক্ষীণ আলোয় ওই প্যাসেজে ঢুকলাম। খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে এগোনোর পরে আবার সেই বেড়ালের মৃতদেহটা পড়ল। পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। খানিকটা এগোনোর পর ওদের দেহগুলো চোখে পড়ল।

কী অপরাধ করেছিল এই নিরীহ ছেলেগুলো যে তাদের এভাবে মরতে হল? আর কেনই বা প্রফেসার একটা ভালো রোবট তৈরি করার জায়গায় এরকম একটা দৈত্য তৈরি করলেন। সবই হয়তো ভাগ্য।

দেহগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার জায়গাও বিশেষ নেই। একটা শরীর সরিয়ে দিতে গিয়ে আরও কীরকম যেন করে উঠল শরীরটা। চামড়া খসে খসে পড়ছে। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। আর এবারে চোখে পড়ল আরও দুটো শরীর। তার মধ্যে একটা হারুর। অন্যটা বোধহয় ডেভিডের যার কথা মার্কের মুখে শুনেছিলাম।

ঘরের প্রায় শেষ দিকে পড়ে আছে। হারুর কাছে গিয়ে দেখলাম। প্রাণ নেই। এখনও শরীর অতটা ঠান্ডা হয়নি। রিগর মরটিস শুরু হয়নি। তার অর্থ দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাহলে ওকে মারা হয়েছে।

ঘরের শেষ প্রান্ত অব্দি গেলাম। চারদিকে শীতল দেওয়াল। এদিক দিয়ে বেরোনোর কোনও পথই নেই। এর মধ্যে ফোন অফ হয়ে গেল। আর চারজ নেই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ফেরার পথ আন্দাজ করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম। পচা দেহগুলো সরিয়ে সরিয়ে।

হঠাৎ তার মধ্যেই টের পেলাম এ প্যাসেজের অন্ধকার যেন আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এত তীব্র সে অন্ধকার যে নিজের উপস্থিতিও যেন নিজের কাছে হারিয়ে যায়।

কেন তা বুঝতে দেরি হল না। এ প্যাসেজে ঢোকার যে পাল্লাটা ছিল, তা কেউ টেনে বন্ধ করে দিয়েছে। এখান থেকে বেরোনোর যে সামান্য আশা ছিল, সেটাও আর থাকল না।

পাল্লার উলটোদিকে ঘরের মধ্যে কে দাঁড়িয়ে আছে তা বেশ বুঝতে পারছি। হিরোসি। যে এতজনকে মেরেছে, তার কাছে আমাকে মারা খুব শক্ত কাজ না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি আমার মৃত্যু এত সহজে হবে না। একটু একটু করে দিনের শেষ আলোর মতো আমি ফুরিয়ে যাব। ও সেটাই চায়। যখন খোঁজ পাওয়া যাবে, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। আর হিরোসির মতো একটা কিলিং মেসিন আরও বেশ কয়েকটা খুন করে ফেলবে তার মধ্যে। ওর মতো একটা সাংঘাতিক ইন্টেলিজেন্ট রোবট অনেক কিছুই করার ক্ষমতা রাখে।

উলটোদিক থেকে এবার কথা ভেসে এল। হিরোসির গলা।

—অনিলিখা, তোমাকে আর হারুকে আমি মারতে চাইনি। কিন্তু না মেরেও উপায় ছিল না। কারণ তোমরা ফিরে যাবে, আর বলে বেড়াবে। তখন আমার পক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা শক্ত হবে। আমাকে নিজেকে রক্ষা করতেই হবে।

—কিন্তু তোমার এসব করে কী লাভ? কী লাভ হয়েছে তোমার এসব নিরীহ ছেলেগুলোকে মেরে?—রাগে চিৎকার করে উঠলাম।

—আগেও বলেছি। ওরা কেউ নিরীহ ছিল না। ওদেরকে পাঠানোই হয়েছিল প্রফেসারের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে। ওদের আসল কাজই ছিল প্রফেসারকে খুন করা। ওরা সবাই MI6-এর।

—কিন্তু হিরোসি, তোমাকে তো কারুর ক্ষতি করার জন্য, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি। তোমাকে তো প্রফেসার তৈরি করেছিল শান্তির দূত হিসেবে। সেসব কি তুমি ভুলে গেলে?

একটু যেন হেসে উঠল, হিরোসি। বলে উঠল,—তুমি কি এ বাড়ির ছবি গুলোর কথা এর মধ্যেই ভুলে গেছ? হিরোসিমার সেসব নিরীহ মানুষগুলোর মৃতদেহের ছবি। ওরা তো কেউ অপরাধ করেনি। ওদের বেশিরভাগের সঙ্গে তো যুদ্ধের কোনও সম্পর্কই ছিল না।

আমি দেখেছি প্রফেসারকে মাঝরাতে তার বাবা-মা আর বোনের ছবি নিয়ে বসে থাকতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুপ করে বসে থাকতেন। কখনও বা নিজের মনে কথা বলতেন। সে চোখে শুধু মৃত্যুর ছবি দেখেছি। সব হারানোর ছবি দেখেছি।—একটু থেমে ও ফের বলে উঠল,—একটা শহর, হাজার হাজার নিরীহ মানুষ একমুহূর্তে হারিয়ে গেল, কই তখন তো তোমরা কেউ প্রতিবাদ করোনি। তোমরা তো একবারও ভাবোনি যে তার পরেও একটা প্রজন্ম বড় হবে যাদের আপনার বলতে কেউ থাকবে না। তোমাদের মিডিয়া কখনও এর জন্য আমেরিকাকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করায়নি। এমন কি সাধারণ মানুষের উপর সবথেকে নিন্দনীয় এই হানাকে তোমরা 'ওয়ার ক্রাইম' বলেও স্বীকার করোনি। উলটে এর সপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করা হয়েছে।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম এ কথাগুলো ওর নয়। আসাহির কথা। ও সেটাই মুখস্থ বলে যাচ্ছে। বলে উঠলাম,—তুমি কি এসব কথা আসাহির মুখে শুনেছ?

—হ্যাঁ, আসাহি আমাকে বলতেন। আমি এ সব কথা আসাহির কাছ থেকেই শিখেছি। আমি এ কাজটা করেছি শুধু আসাহির কথা ভেবে। সে হিরোসিমার ছাপ শুধু দেওয়ালে নয়, রয়ে গেছে আসাহির মনে, আমার মনেও। তবে উনি আমাকে এ কাজ করতে কখনও বলেননি।

—তুমি কি মার্ককেও মেরে ফেলেছ?

—না, ঠিক সেভাবে নয়। তবে ওকেও শাস্তি দিয়েছি যাতে ও আসাহিকে খুনের শাস্তি পায়।

—মানে? কি করেছ ওকে?

অন্যদিক থেকে চুপ করে রইল হিরোসি।—তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে অনিলিখা। কাকুরেনবো।—হেসে বলে উঠল হিরোসি।

কাকুরেনবো অর্থাৎ জাপানি ভাষায় লুকোচুরি।

ও ফের বলে উঠল,—তোমাকে একটা হিন্ট দিই। মানুষের সব থেকে বড় শিক্ষা হয় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। সেটা জানো তো?

—তার সঙ্গে মার্কের উধাও হওয়ার কী আছে?

মনে হল ও যেন ফের হেসে উঠল।

বুঝতে পারলাম আস্তে আস্তে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম,—হিরোসি আমাকে এখান থেকে বেরোতে দাও। আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি।

উত্তর এল না। বুঝলাম রোবটের মন থাকে না। একটা ধীর পায়ের শব্দ ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলাম।

১১

কতক্ষণ আবার এরকম ছিলাম কে জানে? হয়তো কয়েক মিনিট, হয়তো বা কয়েক ঘণ্টা, হয়তো বা কয়েকদিন। শরীর যেন অবসন্ন হয়ে আসছিল। এখানে এমন কিছু নেই যা দিয়ে এই পাল্লাকে ধাক্কা দেওয়া

যায়। এই প্যাসেজের মধ্যে আমার সঙ্গী শুধু কয়েকটা মৃতদেহ, একটা মৃত বেড়াল আর তীব্র পচা গন্ধ। একটু নড়াচড়া করলেই হাত যেন কোনও মৃতদেহে লাগছিল।

খানিকবাদে আবার জোরে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করলাম।

কতক্ষণ জানি না।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম কিছু লোক আমাকে নিয়ে এখানে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধারণা আমিই অন্যদের খুন করেছি। আমি তার প্রতিবাদ করছি। যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু তারা শুনছে না।

ঘুম ভেঙে আবার অন্যভাবে চেষ্টা করলাম পাল্লা খোলার। কাজ হল না। আবার ক্লান্ত হয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। আবার হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অক্সিজেনের অভাবে মাথাও যেন আস্তে আস্তে কাজ করছিল না।

হঠাৎ মনে হল বাইরে আওয়াজ হচ্ছে। অনেক লোক বাইরে ছোটাছুটি করছে।

পুলিশ এসেছে কী?

আমি এবারে ঘরের মধ্যে থেকে চিৎকার করে উঠলাম। বেশ কয়েকবার। দুটো দরজা আছে আমাদের মধ্যে। এটা ভেবে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম। মনে হল ওরা আমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। জার্মানে কিছু কথা শোনা যাচ্ছে ঠিক বাইরে থেকে।

খানিকক্ষণ বাদে দরজা খুলল। সুইস পুলিশ।

কার থেকে খবর পেয়েছে জানি না। কিন্তু বাইরের সামান্য আলোতেও তখন যেন চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। শরীর এতক্ষণ ওইটুকু জায়গায় আটকে থাকার জন্য কীরকম আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে ওখান থেকে বেরিয়ে ওদের ঘরের মধ্যে মৃতদেহগুলোর কথা জানালাম। ওদেরকে হিরোসির কথাও বললাম।

পরে শুনেছিলাম পুরো ষোলো ঘণ্টা এভাবে আটকে ছিলাম। মার্কের ফোন ট্রেস করেই ওরা এই বাড়ির খবর পায়। এমনিতে এটা খুঁজে বার করা সহজ ছিল না। ওরা মার্ককে খুঁজে পায়নি।

উপর থেকে তখনও পিয়ানোর আওয়াজ আসছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মন কেমন করা সুর।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে।

আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।।

খানিকবাদে থেমে গেল।

আমরা সব সতর্কতা নিয়ে উপরে উঠতে যাব, দেখি হিরোসি দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে। সেই শিশুর মতো হাসি। সে হাসি দেখে সুইস পুলিশও দ্বিধা করছিল প্রথমে। পরে আমি আবার বলার পরে ওকে ধরে।

—তারপর?

—আশ্চর্য ব্যাপার। হিরোসিকে যখন ধরা হয় ও কিন্তু কোনও বাধা দেয়নি। জানি না কেন। কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়। মার্ককে পাওয়া যায়নি। মার্কের মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। অথচ আমি নিশ্চিত যে মার্ক ও বাড়িতে এসেছিল। তাহলে ও গেল কোথায়?

—মার্ককে আর পাওয়া যায়নি? এখনও না?—মিলন বলে উঠল।

—তাহলে? কী হয়েছিল আর জানা যায়নি?—আমি বলে উঠলাম।

—সেটা কি বলেছি? পরে একদিন বলব সে কথা।—বলে অনিলিখাদি উঠে পড়ল।

আমরা সবাই তখন মরীয়া। কী হয়েছিল মার্কের বলতেই হবে।

অনিলিখাদি বাধ্য হয়ে খানিকবাদে ফের বলে উঠল,—আসলে যেটা বলব তাতে তোদের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। তাকে যুক্তি-বিজ্ঞান দিয়ে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু যখন জানতেই চাস, বলেই ফেলি। মার্ককে খুঁজে বার করার সব আশাই যখন ছেড়ে দিয়েছি, তখন এ ঘটনা ঘটার ঠিক চারদিন বাদে বিবিসি-তে হিরোশিমার উপরে একটা ডকুমেন্টারি হচ্ছিল। নতুন একটা ডকুমেন্টারি। আসাহির লেখা পড়ে হিরোশিমার উপরে একটা বাড়তি কৌতূহল হয়েছিল। তাই দেখতে বসে গেলাম।

৬ই আগস্ট, ১৯৪৫। এখন তো প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। তাই ওরা ওই বিশেষ দিনে তোলা সাদা কালো অনেক ছবি, ভিডিও থেকে এই ডকুমেন্টারিটা তৈরি করেছে। বোমা পড়ার আগের এক ঘণ্টা এই ডকুমেন্টারিতে খুব সুন্দর দেখিয়েছে। খুব ডিটেলে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে শুরু। হিরোশিমাতে জাপানি একটা সেনা শিবির ছিল। ডকুমেন্টারিতে সে সময়ে যারা সেই ক্যাম্পে ছিল তাদের দেখাল। তাদের মধ্যে কয়েকজন আর্মি ড্রিল করছিল, সেটাও দেখাল। বেশ কিছু সাধারণ মানুষকে দেখাল। কেউ অফিসের পথে। কেউ ট্রামে করে যাচ্ছে। সকাল আটটার সেই এয়ার রেড ওয়ার্নিং শুনে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়াও দেখাল। একটা ব্যাঙ্কে কয়েকজন মহিলা কর্মচারীদের দেখাল। আসলে জাপানে তখন নিয়ম ছিল মহিলাকর্মীদের আগে অফিসে আসতে হবে। পশ্চিমী কিছু মিশনারী যারা জাপানে ছিল পরমাণু বোমা পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, তাদেরকেও দেখাচ্ছিল।

কীভাবে এ সব ছবি-ভিডিও জোগাড় করেছে, কে জানে! তারা জানেও না যে খানিক বাদে আকাশে উড়ে আসতে দেখা যাবে একটা বি ২৯ বিমানকে, যার নাম এনোলা গে। আর তারপরেই আকাশ থেমে নেমে আসবে পরমাণু বোমা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। ওই মিশনারীদের মধ্যে ও কে বসে আছে? ও তো মার্ক। হ্যাঁ, মার্ক। ঠিক সেই চোখ, সেই মুখ, সেই চওড়া ভুরু, সেই এক লাল-সাদা স্কোয়ারকাটা জামা যা আমি দেখেছি। মুখেচোখে উত্তেজনা। আমার দিকেই যেন তাকিয়ে আছে।

—মানে, মার্ক ওই সময় গেল কী করে?—আমরা সবাই অবাক হয়ে বলে উঠলাম।

—সেটাই তো আশ্চর্য কথা! মার্ককে কি হিরোসি পাঠিয়েছিল পরমাণু বোমা পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তের জাপানে, যাতে সেও ওই এক পরিস্থিতির শিকার হয়? ওটাই কি ছিল ওর প্রতিশোধ?

—মানে তুমি বলতে চাও টাইমট্রাভেল।—জোরে বিষম খেয়ে উঠল বিশ্বজিৎ দা।

অনিলিখাদি সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলে উঠল,—আশ্চর্য ব্যাপার হল মার্কের কোনও ছবি বা কোনও প্রোফাইল সুইস পুলিশ খুঁজে পায়নি। ওদের কাছে এটা খুব বড় রহস্য। কী করে সুইজারল্যান্ডে এল, কবে এল—কোনও তথ্যই নেই ওদের কাছে। এটা অনেক সময় MI6-এজেন্টদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সব তথ্য গোপন রাখা হয়। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা হল আমি কী করে ওদের বোঝাব যে মার্ক আমাদের চোখের সামনেই আছে। ওই ডকুমেন্টারির রেকরডিং দেখলেই ওরা মার্ককে দেখতে পাবে। আমি মার্ককে নিজে দেখেছি।

—তুমি ওই ভিডিওটা আবার দেখেছ?—আবার বলে উঠলাম।

—হ্যাঁ, আমি তারপরে বহুবার দেখেছি। তোদেরও দেখাব। দেখাব মার্ককে। স্পষ্ট ওই মিশনারীদের মধ্যে দেখতে পাবি। মনে হবে যেন চোখ তুলে তোর দিকেই তাকিয়ে আছে।

অনিলিখা একটু থেমে বলে উঠল—যা শুনেছি, ওরা এখনও হিরোসির উপরে অনেক রিসার্চ করছে। ওকে এক অত্যন্ত হাই সিকিউরিটি ল্যাবে রাখা হয়েছে। বোঝার চেষ্টা করছে প্রথম সত্যিকারের বুদ্ধিমান রোবটকে। আমি জুরিখ ছাড়ার আগে একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে কী বলল জানিস?

—কী?

হেসে বলে উঠল,—জিকান তো কুকান দে উশিনাওরেটা।

—মানে?—সহেলী অবাক হয়ে বলে উঠল,—কান নিয়ে আবার কী বলল?

—না না। কথাটা হল 'জিকান তো কুকান দে উশিনাওরেটা'। প্রথমে ভেবেছিলাম আমার কাছে হিরোসি ক্ষমা চাইছে। কিন্তু পরে তার অর্থ বুঝলাম—লস্ট ইন টাইম অ্যান্ড স্পেস। অর্থাৎ আমি ঠিকই চিনেছি মার্ককে। ওই ভিডিওতে ওই ছিল। ও পরমাণু বোমা পড়ার কিছুটা সময় আগে হিরোশিমায় গিয়ে পৌঁছেছে। সব জেনে শুনে ও এখন হিরোশিমায় পরমাণু বোমা পড়ার অপেক্ষা করছে। কীভাবে পৌঁছেছে সেটা জানা নেই। তবে কী হবে সেটা জানা আছে।

—অ্যাবসারড। ইম্পসিবল। হতেই পারে না—বিশ্বজিৎদা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

অনিলিখাদি উঠে দাঁড়াল। যেতে যেতে বলে উঠল,—এজন্যই এ ঘটনার শেষ অংশটুকু বলতে চাইছিলাম না। আমি না, স্বয়ং নেপোলিয়ন বলেছেন, ‘Impossible is a word to be found only in the dictionary of the fools.’

অনিলিখা ও সেই লোকটা



সত্যি এখন সব বদলে গেছে। শনিবারের আসরে আমরা প্রায় সবাই এসেছি। কিন্তু কারো মুখে কোনও কথা নেই। সবার চোখ হাতে ধরা ফোনে। গত পাঁচ মিনিট আমরা কেউ কোনও কথা বলিনি।

বাইরে এরই মধ্যে একটু ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রথম বর্ষার বৃষ্টি। ঠিক সময় অনিলিখাদির প্রবেশ। ছাতা আনেনি। ভালোই ভিজে গেছে। ভিজে চটি খুলতে খুলতে বলে উঠল,—বৃষ্টিতে না ভিজলে, বর্ষাকে ঠিকভাবে স্বাগত জানানো হয় না।

অনিলিখাদি পাড়ার শ্যামলদার দোকান থেকে চপ-কাটলেট নিয়ে এসেছে। মুহূর্তে ঘরের পরিবেশ বদলে গেল। কিচেন থেকে প্লেট এনে আমরা সবাই খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

এর মাঝেই অনিলিখাদি বলে উঠল,—আমি ঢোকার আগেই বাইরে থেকে তোদের লক্ষ্য করছিলাম। যেভাবে তোরা বিভোর হয়ে ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বসেছিলি, তাতে মনে হচ্ছিল আগামী দিনে তোরা কথা বলতেই ভুলে যাবি। আর একটা দেশ ধ্বংস করতে পরমাণু বোমার দরকার হবে না, পাওয়ার গ্রিড আর সব মোবাইল নেটওয়ার্ক পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ করে দিলেই হবে। আমরা চুপ!

একটু থেমে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল,—আমাকে আবার ইংল্যান্ডে আর স্পেনে অফিসের কাজে যেতে হবে। অন্য কিছু দেশেও যেতে হতে পারে।

—বাহ! গরম থেকে একটু রেহাই পাবে।—সহেলী বলে উঠল।

—তা ঠিক। তবে এবারে অফিসের কাজের প্রেসার ভালোই থাকবে। অন্য একটা কাজ সারতে হবে।

—কী কাজ অনিলিখাদি?

—একটা চিঠি পৌঁছতে হবে একজনের কাছে। একটা বিশেষ চিঠি।

—চিঠি? এখনকার দিনে চিঠি কেউ লেখে?

—এই চিঠিটা যার উদ্দেশ্যে লেখা তাকে পৌঁছে দিতে হবে।—বলে অনিলিখাদি একটা খাম খুব যত্ন করে ব্যাগ থেকে বার করল। তারপর তার থেকে একটা চিঠি বার করে বলে উঠল,—তোদের একটু পড়ে শোনাই, তাহলে বুঝতে পারবি এ চিঠিটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিয়তমা,

আমার চিঠি লেখার অভ্যেস একদম নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার শব্দগুলো পৌঁছনোর আর কোনও উপায় এখন আমার কাছে জানা নেই। আমি তোমাকে কতটা মিস করছি সেটা জানানোরও আর কোনও উপায় নেই। তাই এই চিঠি।

প্রায় দু'মাস কাদার মধ্যে আটকে থাকার পরে দু'দিন হল একটা ঘর পেয়েছি। ১০৪ নাম্বার ডিভিশনে আছি। এখানে একটা ছোট কিচেনে আমার সঙ্গে আরও চারজন আছে। তবু মনে হচ্ছে কত জায়গা। তোমার কথা খুব মনে হচ্ছে। তুমি যদি এখানে থাকতে, সারাদিনই কথা বলতাম। কত কথা যে বলার আছে।

এখন আমি যেখানে আছি তার কিছুটা দূরেই মজেল নদী। নদীর ধার দিয়ে মাইলের পর মাইল জুড়ে ফক্স হোল। অর্থাৎ কাদা-মাটির মধ্যে গর্ত করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ডিফেন্সিভ পজিশন। আর আছে পরিখা।

যুদ্ধ এখানে আপাতত শেষ। কিন্তু চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন। নদীর উপর দিয়ে যে ব্রিজ ছিল তাও জার্মান আর্মি পিছিয়ে যাওয়ার আগে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে যাতে আমরা সহজে নদী পার করে অন্যদিকে না যেতে পারি। এটা শত্রুপক্ষের সাপ্লাই চেন ধ্বংস করার একটা উপায়। আমাদের যে অংশটা আগে এগিয়ে গেছে তাদের কাছে রসদ পাঠানো সোজা হবে না। আমাদের সামনে একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্ল্যান আছে। কিন্তু সেটা লিখলে এ চিঠি আর তোমার কাছে পৌঁছবে না।

দেখতে দেখতে দেড় বছর হয়ে গেল। এখনও মনে আছে নরম্যান্ডি বিচে ল্যান্ড করার কথা। জাহাজ থেকে নেমে পিঠে ভারী ব্যাগ আর হাতে বন্দুক নিয়ে জল আর বালির মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়ার কথা। গুলি ছুটে আসছিল আমাদের লক্ষ্য করে। কে গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ঘাড় ঘুরিয়ে তা দেখারও অবকাশ ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল ডেভ আর টিনাকে দেখতে ফিরে যেতে পারব তো! সেদিন আকাশ ছিল মেঘলা। কুয়াশায় দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম না কার দিকে ছুটে চলেছি!

আমাদের দিকে উড়ে আসছিল ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বিমান। আর তাদের লক্ষ্য করে গর্জে উঠছিল আমাদের অ্যান্টি এয়ারক্রাফট কামানগুলো। তার মধ্যে দিয়ে বিচের উপরে আমরা ছুটছি। সে যে কী অদ্ভুত দৃশ্য। মনে হচ্ছিল ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া আকাশ যেন তারাবাজি দেখছে।

প্রত্যেকটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া শত্রুবিমান দেখে যে কী আনন্দ হচ্ছিল কী বলব! কিন্তু পরে ভাবছিলাম ওই প্রত্যেকটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমানের মধ্যে যে আছে তার জন্যও হয়তো তোমাদের মতো কেউ অপেক্ষা করে বসে আছে। সে আর ফিরবে না।

সেদিন আমার মিশন সফল হয়েছিল। তারপরে ফ্রান্সের ছোট ছোট রাস্তা, কখনও শস্যখেতের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে এগিয়েছি। সবাই যখন জার্মান সেনার কথা ভাবত, তখনও ওই অবস্থাতেও তোমার কথাই মনে হতো। যদি না ফিরি? এখন মনে হয় সে সময় পেরিয়ে এসেছি।

আমার মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কতদিন যে তোমাদের দেখব বলে অপেক্ষা করে আছি। ডেভ নিশ্চয়ই এতদিনে প্রচুর কথা বলতে শিখে গেছে। টিনা আর ওর সঙ্গে ঝগড়া করে না তো?

অনিলিখাদি থামল। বলে উঠল,—পুরোটা পড়ব না। এটা যার জন্যে লেখা তারই পুরোটা পড়ার অধিকার আছে। তোদের জন্য খানিকটা পড়লাম।

এ চিঠিটা কোথায় পেলে? এ তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা চিঠি বলে মনে হচ্ছে।—প্রতীক বলে উঠল।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তারিখ দেওয়া নেই। ১৯৪৫-এর মাঝামাঝির চিঠি বলে মনে হয়। যে চিঠি লিখেছিল সে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ আর্মিতে ওই সময় ছিল আর অ্যালায়েন্স পাওয়ারের হয়ে জার্মানিতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।

একটা বইয়ের ভেতরে পেলাম। গতকাল কলেজ স্ট্রিটে একটা পুরোনো বই-এর দোকান থেকে 'দ্য পেন অ্যান্ড দ্য সোর্ড' বলে একটা বই কিনেছিলাম। অনেক পুরোনো বই। তার মধ্যেই এই চিঠিটা খামসুদ্ধু পেলাম। খামের উপরে স্ট্যাম্প দেখেই মনে হল যে চিঠিটা বইয়ের থেকে অনেক বেশি পুরোনো। নেহাত কৌতূহলবশত খুলে ফেললাম। খুলে দেখি এই কাণ্ড। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের সারের একটা অ্যাড্রেস লেখা আছে খামের উপরে। কয়েকদিন পরে যখন যাব, তখন এই চিঠিটা নিয়ে যাব।

যিনি লিখেছিলেন, তিনি কি মারা গিয়েছেন?—বলে উঠলাম।

—সেটা হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। না মারা গেলে অবশ্য অনেক বেশি খুশি হব।

—কিন্তু যাকে চিঠি লেখা হয়েছে, তিনি?

—নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইংল্যান্ডে অনেকে ১০০-র বেশি বেঁচে থাকে। না থাকলেই বা কি! তার পরিবারের কেউ না কেউ তো থাকবে। তার হাতে এ চিঠি তুলে দিতে পারলেও খুব ভালো লাগবে।

—কিন্তু এখানে এল কী করে?

—সেটা আমাকেও ভাবাচ্ছে। মনে রাখতে হবে অনেক ভারতীয় সৈন্যও কিন্তু ওদের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছে অ্যালায়েন্স পাওয়ারের হয়ে। তবে সব প্রশ্নের তো উত্তর পাওয়া যায় না। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়, যার উত্তর পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এরকম একটা চিঠির জন্য আমি নিজে তো সারাজীবন অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারি।

আমরা সবাই একবার করে চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখলাম। ছোট ছোট অক্ষরে লেখা। খুব সুন্দর হাতের লেখা। কাগজটা লালচে হয়ে গেছে।

—ওই আড্রেসটা গুগলম্যাপে পেয়েছ?

—কাছাকাছি জায়গা খুঁজে পেয়েছি। ঠিক সেই জায়গার ও রাস্তার নাম বদলে গেছে। ওখানে গিয়ে খোঁজ পাওয়া যাবে আশা রাখি।

একটু থেমে অনিলিখাদি বলে উঠল,—যদি খুঁজে পাই তোদের সবার জন্য সুইস চকলেট আনব।

আমরা সবাই হইহই করে উঠলাম।

২

আমরা সবাই জানি বাবা আর ফিরে আসবে না। শুধু মা সে কথা শুনতে চায় না। এখনও বিশ্বাস করে বাবা ফিরে আসবে। চারবছর হল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যারা ফেরবার, সবাই ফিরে এসেছে। বাবার এখনও কোনও খোঁজ নেই। দু-বছর আগে একটা চিঠি এসেছিল। মা চিঠিটা খাম থেকে খুলে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসেছিল। বারবার জিগ্যেস করেও উত্তর পাইনি।

দিদি বলেছিল, তাতে বাবার সম্বন্ধে কিছু খবর ছিল। দিদি পড়তে পারে। মা কিন্তু চিঠিটা কোথাও সরিয়ে রেখেছে। ও চিঠিতে কী ছিল, তা কখনও বলেনি। যখন পড়তে শিখব, তখন ওই চিঠিটা ঠিক খুঁজে নিয়ে পড়ব।

আমাদের বাড়িটা একটু নির্জন জায়গায়। কাছে একটা চার্চ আছে। লাগোয়া একটা কবরখানা। মা অনেকসময় কবরখানায় গিয়ে গাছের তলায় বসে থাকে। মনে হয় আমাদের সামনে কাঁদতে চায় না। ওখানে গিয়ে কাঁদে। আমি দূর থেকে দেখি। জানি না আমারও কেন তখন চোখে জল আসে।

আমি সবে প্রাইমারি স্কুলে যেতে শুরু করেছি। আমার বাড়ি থেকে স্কুল একঘণ্টার হাঁটা পথ। মাঝে একটা সরু নদীও পার হতে হয়। হাঁটু জল। আমার দিদিও একই স্কুলে যেত। এখন আর যায় না। মা'র সঙ্গে এখন বাড়িতেই থাকে।

এখানে তোমাদের জন্য বলে রাখি, আমার মা আর দিদি একদম অন্যধরনের। আগে এরকম ছিল না। গত দু-বছর কীরকম যেন হয়ে গিয়েছে। মা একদম অন্য রকম হয়ে গেছে। সারাদিন ধরে মাটির পুতুল বানায় আর ঘরে সাজিয়ে রাখে। সেগুলো ঠিক যেন পুতুলও নয়। মা বলে, ওদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রাণ আছে। ওদের সঙ্গে সারাদিন কথা বলে। বিড়বিড় করে।

তার মধ্যে আমার দিকে হঠাৎ করে তাকিয়ে কোনও কোনও দিন বলে ওঠে, ওরা কী বলছে জানিস। বলছে তোদের বাবা ভালো আছে। শিগগিরি ফিরে আসবে।

আমি মন দিয়ে কথা শোনার চেষ্টা করি। মা যখন থাকে না, তখন ওদেরকে ধাক্কা দিয়েও দেখি। পুতুলগুলো কিন্তু কোনও কথা বলে না। নড়েও না।

মাকে জিগ্যেস করেছিলাম। মা বলেছে, বড় হলে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলবে। যেমন দিদির সঙ্গে নাকি কথা বলে। কি জানি!

আমাদের অবস্থা ভালো নয়। মা সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্য কাজ করে। যা পায়, তাতে কোনওরকমে আমাদের চলে। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখলাম, মা একটা আবর্জনার স্তূপে কী যেন খুঁজছে। তারপর দেখলাম দুটো খাবারের প্যাকেট থেকে আধখাওয়া কিছু খাবার বার করে গুছিয়ে ব্যাগে রাখছে।

খুব কান্না পেল। আমি যখন বড় হব তখন এভাবে আমাদের রাস্তায় পড়ে থাকা প্যাকেটের থেকে খাবার খুঁজতে হবে না।

একদিন মাকে জিগ্যেস করলাম,—মা, তুমি কি ম্যাজিক জানো?

—কেন বল তো?

—ওই যে তুমি পুতুলগুলোর কথা বোঝো।

—হ্যাঁ, তা তো জানি। ওরাও আমার কথা বোঝে।

আমার বন্ধুরা বলে, আমার মা নাকি পাগল।

তবে এটা ঠিক আমার মা'র অন্যরকম কিছু ক্ষমতা আছে। মা বলে, লন্ডন শহরের তলায় একটা জায়গা আছে। সেখানে নাকি মাঝে মধ্যে যায়। আমাকে বলেছে একদিন আমাকেও নিয়ে যাবে। ওখানে যারা থাকে, তাদের নাকি অনেক ক্ষমতা। তারা বাবাকেও খুঁজে বার করতে পারবে।

সেদিন টম আমাকে একটা খেলনা বন্দুক ধার দিয়েছিল। আমি বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। দিদির সঙ্গে খেলছিলাম। হঠাৎ মা'র যে কী হল! আমাকে খুব মারল। তারপরে খেলনা বন্দুকটা ভেঙে দিয়ে বলে উঠল, —এসবের জন্যই তোর বাবাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। চারদিক চাঁদের আলোয় ভাসছিল। আমাকে তারায় ভরা আকাশ দেখিয়ে বলে উঠল,—আমরা এসব হাতে নিয়ে শুধু যুদ্ধ শুরু করি। ওদের থেকে শিখতে পারি না। ওদের দিকে তাকাবি আর ভাববি, আমরা কত ছোট। কত ছোট ছোট কারণে যুদ্ধ করি। বলে কাঁদতে শুরু করল।

খানিকবাদে মা খেলনা বন্দুকটা ঠিক করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারেনি। টম আমার সঙ্গে আর কথা বলে না।

আমি এখন রোজ অনেক রাত অব্দি আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি যাতে আমার মধ্যে কোনওদিন যুদ্ধ করার ইচ্ছে না হয়।

৩

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আজ স্কুল থেকে ফিরে দেখি মা নেই। দিদিও নেই। দেখলাম আমার জন্য আমার খুব পছন্দের কিছু খাবার রাখা আছে। খিদে পেয়েছিল। খেয়ে নিলাম।

ভেবেছিলাম ওরা খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। কিন্তু তারপরে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। ওরা এখনও ফিরে আসেনি।

বাইরে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। কোথায় খুঁজতে যাব? এখানে কাছাকাছি তো কেউ থাকে না। কেউ আমাদের সঙ্গে মেশেও না।

তবু বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এখন ঠান্ডা পড়েছে। মা'র হাতে বোনা উলের সোয়েটারটা পরে খুঁজতে বেরলাম। হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তাহলে কি মা'রা মাটির তলার ওই শহরটাতে গিয়েছে!

কিন্তু সে তো অনেক দূর? আমি একা কী করে যাব?

মা'র সঙ্গে এর মধ্যে একদিন গিয়েছিলাম। সে খুব ভয়ের জায়গা। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ। যেন গোলকধাঁধা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনেকটা যাওয়ার পর একটা লেক পড়ল। মাটির নীচে এরকম আগে দেখিনি। তার দিকে তাকিয়ে মা বলে উঠল,—ওখানে জলের মধ্যে মেয়েটা থাকে। যখন আমি থাকব না, এখানে আসবি। ভয় পাবি না।

জিগ্যেস করেছিলাম,—ও কে মা?

—সে কথা এখন বলছি না। বললে ভয় পাবি। তবে যাদের সাহস আছে, যারা ভালো, তাদের ও কিছু ক্ষতি করে না।

—ও কি ভূত?

মা তার উত্তর দিল না। আমি মা'র হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

মনে হল, মা ওখানে যায়নি তো? কিন্তু আমি তো ওখানে একা একা যেতে পারব না।

ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপছিলাম। রাতের তারাভরা আকাশ নীচে আমার উপর নেমে আসছিল। যেন আমাকে ছুঁয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, আশ্বাস দিচ্ছিল যে আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি। ভয়ে ভয়ে আবার ঘরের দিকে

এগিয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকেই কান্না পেল। মা নেই। দিদি নেই। বাবা নেই। কেউ নেই আমার। শুধু ঘরময় সেই পুতুলগুলো। ওরাই কি এখন থেকে আমার একমাত্র সঙ্গী?

ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। মনে হল একটা পুতুল ঠোঁট নাড়ছে। যেন কিছু কথা বলতে চায়।

৪

জুলাই মাস। মাদ্রিদে এখন দিনের বেলা বেশ গরম থাকে। তবে আজ এখানে বেশ হাওয়া দিচ্ছে। গরমটা অতটা বোঝা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞানী ইগন্যাকোকে ন্যাকো বলেই চেনে সবাই। শুধু স্পেন কেন সারা বিশ্বের কম্পিউটার জগতের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরাই ন্যাকোকে চেনে। তার কারণ আরও উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরাও যা করতে পারেননি, সেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করেছেন উনিই প্রথম।

কাজটা সহজ ছিল না। একটা সাধারণ কম্পিউটার ০ আর ১-এর বাইরে ভাবতে পারে না। কোয়ান্টাম কম্পিউটার সেখানে কিউবিটের উপরে নির্ভর করে কাজ করে—যার মান ০ থেকে ১-এর মধ্যে যা কিছু হতে পারে। এই কম্পিউটার অ্যাটমের লেভেলে গিয়ে কাজ করে। একটা অ্যাটম ঘূর্ণমান অবস্থায় একটা মুহূর্তে একই সঙ্গে ২৫ শতাংশ উপরের দিকে আর ৭৫ শতাংশ নীচের দিকে থাকতে পারে। এভাবে ঘূর্ণমান অ্যাটমের অভিমুখের ওপরে নির্ভর করে সাধারণ কম্পিউটারের থেকে এ ধরনের কম্পিউটার অনেক বেশি তথ্য রাখতে পারে। তাই কোয়ান্টাম কম্পিউটার স্পিড আর পারফরমেন্সে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।

অনেকেরই ধারণা এরকম একটা আবিষ্কারের জন্য ন্যাকো নোবেল পুরস্কার পেতে চলেছেন। একটা বিখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানি ওঁর আবিষ্কারের ওপরে নির্ভর করে একটা অত্যাধুনিক ল্যাব বানাচ্ছে। ন্যাকোর জন্ম স্পেনে হলেও কর্মজীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে সুইজারল্যান্ডে। জুরিখে। তবে আবার এক বছর হল ন্যাকো স্পেনে ফিরে এসেছেন।

গাড়ি থাকলেও মেট্রোতেই যাতায়াত পছন্দ ন্যাকোর। গ্র্যান ভিয়া স্টেশনে নেমে বাইরে বেরিয়ে এল ন্যাকো। এটাই প্রায় মাদ্রিদের কেন্দ্র। মাদ্রিদের জমজমাট শপিং স্ট্রিট। এখন এখানে এ সময়ে উৎসবের মেজাজ। রাস্তা যেন লোকের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। এখানেই কিছু দূরে আছে স্পেনের রয়্যাল প্যালেস। স্পেনের বর্তমান রাজা অবশ্য থাকেন শহরের বাইরে জারজুয়েলা প্যালেসে।

কাছেই দ্য কাফে মাদ্রিদে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ও ডিনার খাওয়ার কথা। হঠাৎ একজন মাঝারি হাইটের ইংলিশ টুরিস্ট একটা কাগজ দেখিয়ে একটা অ্যাড্রেস জিজ্ঞাসা করল।

এখন সবাই গুগল ম্যাপে ঠিকানা খুঁজে নেয়। তবু ন্যাকো যতটা সম্ভব ডিরেকশান দেওয়ার চেষ্টা করলেন। জায়গাটা পাঁচ মিনিটের থেকে বেশি দূরে নয়।

লোকটা ডিরেকশন নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে গেল।

রাস্তা উপরের দিকে উঠে গেছে। এগোতে গিয়ে ন্যাকোর মনে হল শরীরটা কীরকম লাগছে। অবাক হয়ে লক্ষ করল ডানহাতে কী একটা সাদা পাউডার লেগে আছে। কখন লাগল? এটা কী? নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকে বোঝার চেষ্টা করল। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। একটু দূরে একটা বেঞ্চ আছে। তার উপরেই টলতে টলতে গিয়ে বসে পড়ল ন্যাকো। খানিকক্ষণের মধ্যে মনে হল নিজের বুদ্ধির উপরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু কথা বেরোল না। চোখের সামনে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল মুহূর্তের মধ্যে।

দূর থেকে ওই লোকটা এতক্ষণ ন্যাকোকে লক্ষ্য করছিল। কাছে এসে একটা সাদা কাগজ পাশে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে ‘I’ লেখা।

৫

সুইডেনের স্টকহোম। আরল্যান্ডা এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করেই যেতে পারত হ্যান্স। কিন্তু তা না করে হ্যান্স আরল্যান্ডা এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে উঠে বসল। অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। আসলে এ শহরের সব রাস্তাঘাটই হ্যান্সের চেনা। এখন আমেরিকায় থাকলেও একটা বড় সময় এখানে কাটিয়েছে হ্যান্স। এখানকার রয়্যাল ইনস্টিউট অফ টেকনোলজিতে পড়াশোনা হ্যান্সের। এখানে থাকাকালীনই ও প্রথম ভেবেছিল একটা বিশেষ সোশাল নেটওয়ার্কের কথা। তখনও ভাবেনি যে ওর এই সোশাল নেটওয়ার্ক তিন বছরে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

এখানে ও গেমিফিকেশনকে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ যে যত সময় ওর নেটওয়ার্কে থাকবে, যত বেশি বিষয়ে বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে, যে যত বেশি জনকে বা যত বেশি সংস্থাকে বিচার করে নাম্বার দেবে, সে তত বেশি পুরস্কৃত হবে। পুরস্কার মানে টাকা পয়সা কিছু না। সোশাল নেটওয়ার্কে সেই লোকটির স্ট্যাটাস বাড়বে। যার ভিত্তিতে ভিসা, হোটেল, বন্ধু পাওয়া আরও সহজ হবে।

ব্যাপারটা যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে তা নিজেই ভেবে উঠতে পারেনি। এখন অনেকে দিনের পর দিন রাতেও না ঘুমিয়ে ওর নেটওয়ার্কে কাটায়। এই তো সেদিন একটা ষোলো বছরের ছেলে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। তার নাকি এমন নেশা হয়ে গিয়েছিল যে আঠেরো দিন একটানা নেটওয়ার্কে ছিল। অনেকে আশেপাশের মানুষের কথাও খেয়াল রাখে না। তারা শুধু থাকে তাদের এই ভারচুয়াল জগতের বন্ধুদের সঙ্গে। অনেকে ভুলেও যায় বাইরের বাস্তব জগতের অস্তিত্বের কথা। সবকিছুর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই নেটওয়ার্কিং স্ট্যাটাসের মোহ।

এই তো ক'দিন আগের কথা। এক বছর তিরিশেকের লোক নাকি খেলতে খেলতে এটাও খেয়াল করেনি, যে তার বাবা দু'দিন আগে মারা গেছে। ওরা দুজনেই থাকত সে বাড়িতে। বাবার মৃতদেহ দু'দিন ধরে বাড়িতেই দোতলার ঘরে পড়েছিল। ভাগ্যিস সে ঘরের জানলা খোলা ছিল। এমন গন্ধ বেরোতে শুরু করে যে পাশের বাড়ি থেকে প্রতিবেশী চলে এসে মৃতদেহ আবিষ্কার করে। এসে দেখে ছেলে তখনও খেলে যাচ্ছে।

আজ তাই হ্যান্সের নাম পৃথিবীর সবথেকে বড়লোকেদের তালিকায়। নিজস্ব কুড়িটারও বেশি প্রাইভেট জেট আছে। সারাক্ষণ মিডিয়ার সামনে থেকে থেকে ও যেন একটু হাঁফিয়ে উঠেছে ইদানীং।

তাই মাঝেমধ্যে হ্যান্সের ভালো লাগে একদম সাধারণের মতো করে কিছু সময় কাটাতে। যখন আশেপাশের কেউ ওকে বিলিওনেয়ার হ্যান্স বলে চিনবে না। ও যখন ফিরে যেতে পারবে ওর কলেজের দিনগুলোতে। ওকে অন্তত কিছুটা সময় মুহূর্তের হিসেবে কাটাতে হবে না।

তাই মাঝেমধ্যে ও যখন পৃথিবীর নানান প্রান্তে যায়, তখন হাতে গোনা বিশেষ কিছু লোক ছাড়া আর কেউ সে যাওয়ার কথা টের পায় না।

এখন রাত ন'টা। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে ও বাদে আর একজনই আছে। বাইরে এখনও দিনের উজ্বল আলো আছে। এখানে এখন রাত বারোটা অব্দি আলো থাকে। আবার চারটেতে ভোর হয়ে যায়।

স্টকহোমে এবারে অবশ্য কয়েকটা কারণে আসা। তার মধ্যে একটা বিশেষ কারণ অ্যালফা এক্সের মিটিং। অ্যালফা এক্সের কথা সারা বিশ্বে খুব কম লোকই জানে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সিলেক্ট গ্রুপে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কী এই অ্যালফা এক্স?

এরা হল এক বিশেষ মানবগোষ্ঠী। বিশ্বের কয়েকজন বিলিওনেয়ার মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠীর দরকার যারা অন্য সবার থেকে আলাদা হবে। যারা বুদ্ধিতে-মেধায় অন্য সবার থেকে অনেক এগিয়ে থাকবে। সেটা তৈরি করতে যা খরচ হবে তা সে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হোক, বা কোনও চিপ ইমপ্লানট হোক, তার খরচ বহন করবে এই গ্রুপ। পরিবর্তে এই মানবগোষ্ঠী নতুন যা আবিষ্কার করবে তার থেকে পাওয়া মেধাসম্পদে শুধু অধিকার থাকবে এই গ্রুপের—অ্যালফা এক্সের। এবিষয়ে কিছু দরকারি মিটিং হবে এবারে এখানে।

ট্রেনে চেপে স্টকহোম শহরের কেন্দ্রে পৌঁছতে মিনিটকুড়ি সময় লাগে। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসে হ্যান্স। ফাঁকা রাস্তা। নিশ্চিন্তে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যায় পাশের ম্যারিয়ট হোটেলের দিকে।

একটা লোক ওর পিছন পিছন আসছে। ট্রেনের ওই লোকটা কি?

সর্বনাশ, ওকে দেখে চিনতে পেরে গেছে! যেভাবে সারাক্ষণ দেশে-বিদেশে খবরে ওকে দেখায়, তাতে চিনে ফেলাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

—আচ্ছা, সিটি হল টাওয়ারটা কোথায়?

এখানকার সবাই সিটি হল টাওয়ার চেনে। নির্ঘাত টুরিস্ট হবে। সাদার্ন- ইংল্যান্ডের লোকের অ্যাকসেন্ট। মাঝবয়সি লোক। বেশ সম্ভ্রান্ত দেখতে।

—এখান থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথ। বলে লোকটাকে ডিরেকশন দেয়।

লোকটা ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। একটু দ্বিধা নিয়ে হ্যান্ডশেক করে হ্যান্স। তারপর হ্যান্স এগিয়ে যায় ম্যারিয়ট হোটেলের দিকে। কিন্তু হঠাৎ যেন অসহ্য মাথা যন্ত্রণা শুরু হয়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। পায়ের তলার মাটি যেন কেঁপে ওঠে। কোনওরকমে রাস্তাতেই বসে পড়ে। উঠতে গিয়ে দেখে উঠতে পারছে না। কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছে। তার পরেই চোখে ঘন অন্ধকার নেমে আসে।

একটা লোক দূরে অপেক্ষা করছিল। মাটিতে শুয়ে পড়া হ্যান্সের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা সাদা চিরকুট ফেলে যায়। তাতে লেখা ‘L’।

৬

অফিসের কাজের পরে লন্ডনের কেন্সিংটন গার্ডেনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল অনিলিখা। এখানেই কেন্সিংটন প্যালেস। ইংল্যান্ডের যুবরাজ এখানেই থাকেন। একসময় প্রিন্স চার্লস ও প্রিন্সেস ডায়ানা থাকত এখানে। কিছুদিন আগে প্রিন্স হ্যারির বিয়ের সময়ও সব মিডিয়ার নজর ছিল এখানে।

অনিলিখার কাছে কেন্সিংটন গার্ডেনের আকর্ষণ অবশ্য তার জন্য নয়। এই বাগানের মূল আকর্ষণ বাগানের মধ্যের বড় লেক। দেশ-বিদেশের নানান ধরনের হাঁস আছে এখানে।

অফিসের একটা দরকারি মিটিং সবে শেষ হয়েছে। তার পরেই অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। মিটিং-এর কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল অনিলিখা।

হঠাৎ মাঝারি হাইটের সোনালি চুলের সুদর্শন এক সাহেব এসে জিগ্যেস করল,—ম্যাডাম, ক'টা বাজে?

অনিলিখা ফোন দেখে উত্তর দেওয়ার আগেই উত্তর এল,—জাইকা— ৬টা। —বলেই লোকটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

লোকটাকে এক ঝলক দেখলেও লোকটার তীকষ্নদৃষ্টি মনে রাখার মতো।

জাইকা কোথায় তা ভালোই জানে অনিলিখা। এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।

কিন্তু লোকটা কে? যাবে কি?

এখন চারটে। নিশ্চয়ই লোকটা এটাও জানে যে, অনিলিখার অফিস কাছেই। তা না হলে এতক্ষণ এখানে থাকবে ধরে নিত না। কী-ই বা হবে? কৌতূহল নিরসনের জন্যই অন্তত যাওয়া দরকার।

ঠিক ছ'টার সময় ওই রেস্টুরেন্টের সামনে যেতেই অনিলিখা খেয়াল করল লোকটা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে হাঁটতে শুরু করল।

অনিলিখা লোকটার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। লোকটা মিনিট পাঁচেক পরে পুরোনো দিনের একটা ভিক্টোরিয়ান বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটু থেমে একবার মুখ ঘুরে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

অনিলিখাও ভেতরে ঢুকে এল। ঢোকার পরেই একটা লম্বা বারো ফুট চওড়া লবি। পাশ দিয়ে পর পর ঘর।

তার একটাতে লোকটা অনিলিখার মুখোমুখি এসে বসল।

একটা কার্ড এগিয়ে দিল অনিলিখার দিকে—আমার নাম মাইক। আমি MI6-এ কাজ করি। একটা বিশেষ কারণে আপনার সাহায্য চাই। বিজ্ঞানী মহলে আপনি দেশ-বিদেশের অনেককেই চেনেন। গত আট সপ্তাহে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও ইংল্যান্ডে চারজন নামকরা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ মারা গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে হার্ট অ্যাটাক মনে হলেও, আমরা পরে জানতে পেরেছি যে এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ নার্ভ এজেন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। যে নার্ভ এজেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা এখনও অব্দি পরিচিত নই। তবে অত্যন্ত শক্তিশালী কোনও নার্ভ এজেন্ট যাতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হচ্ছে। এদের মধ্যে আছেন স্পেনের কম্পিউটার বিজ্ঞানী ইগন্যাকো লোপেজ, সুইডিশ প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ী 'লস্ট ইন টাইম' সোশ্যাল নেটওয়ার্কের অধিকর্তা হ্যান্স মারগোলিস, বিখ্যাত জার্মান প্রযুক্তিবিদ ম্যারিও হ্যাবারমান, বিখ্যাত সুইস সায়েন্টিস্ট ও ব্যবসায়ী মাইকেল থাম।

পরপর নামগুলো বলে গেল লোকটা।

—এদের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

—আমি এদের নাম ও কাজের সঙ্গে পরিচিত। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার বিভিন্ন কনফারেন্সে দেখা হয়েছে, তবে তার বেশি তেমন কোনও পরিচয় ছিল না। আমিও এদের অকাল মৃত্যুর খবর পেয়ে খুব অবাক হচ্ছিলাম। ভাবছিলাম এ কী হচ্ছে? এ কি অতিরিক্ত টেনশন-কাজের চাপের জন্য! খবরটা হার্ট অ্যাটাক হিসেবেই দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে।

—হ্যাঁ, আমরাই চাইনি কোনও প্যানিক তৈরি হোক এর জন্য। বুঝতেই পারছেন, এরা শুধু নামী সায়েন্টিস্টই নন, প্রত্যেকেই মাল্টিবিলিওনেয়ার। প্রচণ্ড বড়লোক। তা এদেরই যদি আমরা নিরাপত্তা না দিতে পারি, তাহলে সাধারণ মানুষ কী ভাববে! তা ছাড়া এখানে এমন একটা নার্ভ এজেন্ট মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যার কথা আমরা এখনও কেউ জানি না।

—তা আপনাদের কী মনে হয় কোনও টেররিস্ট সংস্থা এর পিছনে আছে?

—হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে তাই সন্দেহ করা হচ্ছে। এর পিছনে রাশিয়ার মতো কোনও দেশের সরকারও থাকতে পারে। খুব সংগঠিত না হলে এরকমভাবে মারা যেত না। কোনও সাক্ষীও পাওয়া যায়নি। যেই করে থাকুক না কেন, খুব প্রস্তুতির সঙ্গে নেমেছিল। আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আক্রান্তের পাশে আবার একটা কাগজ ফেলে গেছে। প্রথম খুনের পরে লেখা ছিল 'I'. দ্বিতীয় খুনের পরে 'L', তৃতীয় খুনের পরে 'U', চতুর্থ খুনের পরে 'O'—এই দেখুন বলে মাইক ফোনে পরপর কাগজ থেকে তোলা ছবি দেখাল।

—অনিলিখা ছবিগুলো খেয়াল করে দেখল। চারটে কাগজ। ডটপেনে লেখা। 'I', 'L', 'U', 'O'

—কোনও সংগঠনের নামের শুরুর আদ্যক্ষর?

—নাহ, ওরকম নামের কোনও সংগঠন নেই। অন্য কিছু।

অনিলিখা আবার ফোনের ছবিটা নিয়ে একটু ভালো করে দেখল। ফের বলে উঠল,—আরেকটা জিনিস হতে পারে। তাড়াতাড়ি করে লেখার জন্য এরকম লাগছে। চতুর্থ কাগজটায় যেটা আছে সেটা কিন্তু 'O' নয়। মনে হচ্ছে একটা স্কোয়ার।

—তাই নাকি?

একটু ভালো করে দেখে অনিলিখা ফের বলে উঠল,—এবারে মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি।

—কী? কী হতে পারে?—মাইক উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল।

—ট্যালিমার্ক। সিম্পলি 1, 2, 3, 4 লিখেছে ট্যালি মার্কে।

—কিন্তু ট্যালিমার্ক তো অন্যরকম হয়।

—না, সাউথ আমেরিকায় এরকমভাবে আগে ট্যালিমার্ক দেওয়া হতো। আপনি ভেরিফাই করে নেবেন। কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত।

—তাই? এক্সেলেন্ট ইনফরমেশন।

—এতে দুটো জিনিস বোঝা যায়। এক, এই সব ঘটনার পিছনে যে একজন বা একই সংস্থা আছে তা সে আপনাদের জানাতে চায়। একইসঙ্গে সে আপনাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আরও করবে, এরকম হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। দুই, তার অঙ্কে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। খুব সম্ভবত লোকটি দক্ষিণ আমেরিকার। তা না হলেও ওই ট্যালি মার্কের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

—তা আপনার চেনা তেমন কেউ আছে, যাকে আপনার সন্দেহ হয়?

—না সেরকম কারুর কথা মাথায় আসছে না। আপনি এখানকার বিজ্ঞানীদের ও প্রযুক্তিবিদদেরও জিগ্যেস করুন।

—হ্যাঁ, তা আমরা অবশ্যই করব। একইসঙ্গে আপনাকেও সাবধান করে দিই। যারা মারা গেছেন তাদের সঙ্গে আপনার প্রোফাইলও খানিকটা মিলে যায়। বুঝতেই পারছেন আমাদের দিক দিয়ে সতর্ক করে দেওয়াটা উচিত। আমরা এখানকার কিছু সায়েন্টিস্ট যারা টার্গেট হতে পারে, তাদের সতর্ক করে দিয়েছি। খবরটা আমরা মিডিয়ার থেকে দূরে রেখেছি যাতে কোনওরকম প্যানিক না হয়। একইসঙ্গে ইন্টারপোলের ও ইউরোপের বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স এজেন্সির সঙ্গে কাজ করছি আমরা।

আরও খানিকক্ষণ কথা বলার পরে অনিলিখা ওই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। সাড়ে সাতটা বাজে। সারাদিন গরম থাকলেও এখন ঠান্ডা মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তায় দেশ-বিদেশ থেকে বেড়াতে আসা টুরিস্টের ভিড়। শেষ বিকেলের আলোয় লন্ডন আরও রূপসী হয়ে উঠেছে।

৭

আগে এ জায়গাটা লন্ডনের থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল। কিন্তু শহর হাত-পা ছড়াতে ছড়াতে একে প্রায় কাছে টেনে নিয়েছে।

চিঠির অ্যাড্রেসটা নিয়ে বেশ রিসার্চ করে এসেছিল অনিলিখা। তাই গুগল ম্যাপে ঠিকানাটা পাওয়া না গেলেও বাড়িটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হল না। বাড়িটায় এখন কেউ থাকে না। একতলা ছোট বাড়ি। বাইরের বাগান বড় ঘাসে-আগাছায় ছেয়ে গেছে। বাড়ির পাশে একটা বড় বার্চ গাছ। বাড়িটাতে যে কেউ অনেকদিন থাকে না, তা নিশ্চিত। কিছু দূরে একটা চার্চ আর কবরখানা।

কাকে জিগ্যেস করা যায় ভাবতে ভাবতে একটু দূরে একটা স্কুল চোখে পড়ল।

স্কুলের রিসেপশন থেকে একজন লোকের ঠিকানা পাওয়া গেল যিনি নাকি এখানে বহুবছর ধরে আছেন। একসময় লোকাল কাউন্সিলারও ছিলেন। উনি জানতেও পারেন।

সে ঠিকানার মালিককেও খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। স্টিভ মেজ। অনেক বয়স হয়েছে। দেখে মনে হয় আশির কাছে বয়স হবে।

ওই ঠিকানায় ১৯৪০ নাগাদ কে থাকত জিগ্যেস করতে একটু আগ্রহী কড়া চোখে তাকিয়ে নিলেন অনিলিখার দিকে।

—আপনি কোনও সাংবাদিক নন তো?

—না, না। আমার আসলে ওই পরিবারের যে কোনও জীবিত সদস্যের সঙ্গে দেখা করার খুব দরকার ছিল। একটা বিশেষ জিনিস দেওয়ার ছিল।

—এ গ্রামের, হ্যাঁ, তখন এটা গ্রামই ছিল। আগে তো এত লোক এখানে থাকত না। তখন লন্ডনের সঙ্গে এখানকার এত ভালো যোগাযোগও ছিল না। সে আমার ছোটবেলার কথা। গ্রামের ওই দিকটা ছিল একদম ফাঁকা ফাঁকা। আমার বাড়ি থেকে বারণ ছিল ওই দিকটায় যেতে। শুনেছিলাম ওখানে এক পাগলী মহিলা থাকত। তার সঙ্গে থাকত তার এক ছেলে আর এক মেয়ে। মহিলার স্বামী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যান। তারপর একদিন নাকি রাতারাতি ওই মহিলা আর ওঁর মেয়ে উধাও হয়ে যায়।

ওই মহিলা নানান ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিক জানত। আমি অবশ্য তাকে দেখিনি কখনও। ওর ছেলে, কি যেন নাম ছিল তার, বিল, নাহ নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, সেও ভারি অদ্ভুত ছিল। আমার থেকে দু-বছরের বড় ছিল। কারুর সঙ্গে মিশত না। আমরা সবাই হাসাহাসি করতাম ওকে নিয়ে। ওর মা আর বোনের উধাও হওয়ার এই ঘটনাটা ঘটার পরে ওকে নিয়ে ওর এক কাকা এখান থেকে চলে যায়। বাড়িটা বিক্রি করে দেয়।

তারপরে এক ইতালিয়ান পরিবার ছিল কয়েকবছর। কিন্তু ওখানে আসার পরেই ওদের পরিবারেও পরপর অঘটন ঘটতে থাকে। ওঁর স্ত্রী প্রথমে মারা যায়। তারপর ওঁর ছেলেও একবার ভয় পেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিন বছর বাদে বাড়ি বিক্রি করে চলে যান। তারপর ওই বাড়ি তিনবার হাতবদল হয়। কিন্তু যারাই এসেছে, তারা বেশিদিন ওই বাড়িতে টিকতে পারেনি। এতটাই বদনাম হয়ে গেছে, যে গত কুড়ি বছর আর কেউ থাকে না ওখানে।

—তা ওই ছেলেটা কোথায় এখন জানা আছে?

—এত বছর আগের ঘটনা, কেউই জানবে না।

—তাহলে কোনওভাবে ওর ঠিকানা জোগাড় করা সম্ভব নয়! আসলে আমার একটা খুব দরকারি চিঠি দেওয়ার ছিল।

একটুক্ষণ চুপ করে ভাবল সিভ। তারপরে বলে উঠল,—একটা উপায় আছে। শুনেছিলাম ছেলেটা রেডিং গ্রামার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ওদের কাছে খোঁজ করা যেতে পারে। ওখানে প্রত্যেক স্টুডেন্টের রেকর্ড থাকে। তবে ষাট বছর আগের কথা। রেডিং গ্রামার স্কুল আপনি গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন।

আর বেশি সময় ছিল না ওখানে অনিলিখা। ওখান থেকে বেরিয়ে আরও দু-তিনজনকে জিগ্যেস করেছিল কিন্তু কেউই বলতে পারেনি।

৮

আমাকে সবাই পাগল ভাবে। ভাবে আমিও আমার মা'র মতো, বোনের মতো। হয়তো তাই।

আমি একা থাকতে ভালোবাসি। আসলে বাতাসে যে সুর ভেসে বেড়ায়, সে সুর শোনার মধ্যে একটা নেশা আছে। আর কোনও কথা শুনতে ভালো লাগে না। আমি তাই সময় পেলেই বাইরে চলে এসে সে সুর শুনি। নীল আকাশের তলায় বসে থাকি। কখনও ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ে আকাশ দেখি। গায়ের উপরে প্রজাপতি এসে বসে। পোকারা গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। পাশে হলুদ ঘাসফুল দোলা দেয়। হাওয়া দিলে মাথার উপরের গাছগুলো আমার গায়ে পাতার চাদর বিছিয়ে দেয়। সরু সরু ডাল আর পাতায় ভরা মাথা ঝাঁকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে। ওদের নিয়ে বেশ থাকি।

ক্লাস আমার ভালো লাগে না। আমি যে সব সাবজেক্টে খারাপ রেজাল্ট করি, তা কিন্তু নয়। অনেকে বলে, আমি নাকি অংকে জিনিয়াস। কেন বলে জানি না।

আসলে সংখ্যাগুলো যেন আমার সঙ্গে কথা বলে। আমাকে যখন কোনও অংক করতে দেওয়া হয়, সংখ্যা দিয়ে কোনও কিছু করতে দেওয়া হয়, তখন ওদের দিকে তাকালেই মনে হয় ওদেরও যেন আমার মতোই হাত-পা আছে। আমার মতোই একটা নাম আছে—চরিত্র আছে। মনে হয় ওদের আমি অনেক আগে থেকেই চিনি।

তাই সবাই যখন দুটো সংখ্যাকে গুণ করে, ভাগ করে পাতা ভরায়, আমি তখন ওদের মধ্যে মিল দেখি, প্যাটার্ন খুঁজে বার করি। কী করে জানি না উত্তরটা আমার চোখের সামনে চলে আসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

যখন টিচার জিগ্যেস করে কী করে ওই রেজাল্টটা পেয়েছি, তখন বলতে পারি না। ওরা আগে ভাবত আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি। কিন্তু এখন বুঝতে পারে যে আমি তা করি না।

দুটো লোক একসঙ্গে এলে কী করব বুঝতে পারি না। কিন্তু কয়েকটা সংখ্যা একসঙ্গে দিলে কী কী হতে পারে, তা আমি সেই মুহূর্তে বুঝে যাই। ওরা অবাক হয়, ভাবে আমার বুঝি অন্যরকম কোনও ক্ষমতা আছে। ওরা বুঝতে পারে না, যে সংখ্যাগুলোর একটা ভাষা আছে। তারা যেন আমার সঙ্গে ঠিক সেই ভাষায় কথা বলে।

মা ঠিকই বলত। পুতুলগুলোও নিশ্চয়ই কথা বলে। আমি শুধু বুঝি না। যখনই সময় পাই, ওদের সামনে গিয়ে বসি। বোঝার চেষ্টা করি। ওরাই হয়তো আমাকে কোনওদিন বলে দেবে আমার মা আর দিদি কোথায় আছে।

আমি শহরের তলার ওই জায়গাটা খোঁজারও অনেক চেষ্টা করেছি। কোথা দিয়ে নীচে ঢুকতে হয়, কিছুতেই মনে পড়ে না। একদিন খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। রাস্তা চিনে আর ফিরে আসতে পারছিলাম না। একজন পুলিশ একা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেখে আমাকে ধরল। অনেক প্রশ্ন করল। তারপর আমাকে ধমকক্ষ্মধামক দিয়ে আমার হোস্টেলে পৌঁছে দিল।

তোমাদের বলা হয়নি। আমি এখন একটা অন্য জায়গায় থাকি। একটা-হোস্টেলে।

আমার এক কাকা আছে। আমাদের ওই বাড়িটা বিক্রি করে আমাকে এখন এই হোস্টেলে রেখে গেছে। কাকাই আমার গার্জেন। তবে বেশি দেখা হয় না। দু-মাসে এক বার এখানে আসে।

সেদিন স্কুল থেকে সবার সঙ্গে একটা সমুদ্রতীরে গিয়েছিলাম। বালির বীচ। সেখানে স্কুল থেকে নানান ধরনের খেলাধুলোর আয়োজন করেছিল। আমি এক ফাঁকে পালিয়ে দূরে সরে এসেছিলাম। সমুদ্রের জলের মধ্যে গিয়ে বসেছিলাম। ঢেউ-এর মধ্যে সূর্যের আলোয় মণিমুক্তো ভেসে বেড়াচ্ছিল। চকচক করছিল। কখন জানি আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল।

আমার সঙ্গে কেউ এরকম ভাবে মেশেনি। যত ওদের কাছে যাওয়া যায়, তত ভালো ওদের কথা বোঝা যায়। আমিও তাই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ওরা আমাকে নিয়ে লোফালুফি করে খেলছিল।

কতক্ষণ এরকম জলের মধ্যে ছিলাম জানি না। আমি নাকি প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম। আমাকে ওরা জল থেকে উদ্ধার করে। আমাকে সেদিন খুব বকুনি খেতে হয়েছিল। বারবার বলছিল, আমি যেন আর কখনও জলের কাছে না যাই। ভাগ্য ভালো ছিল তাই বেঁচে গেছি।

যখন বাসে উঠলাম, ওরা তখনও দূর থেকে ডাকছিল। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। আবার কোনওদিন আমি ওদের কাছে যাব।

ইংল্যান্ডের কিংস কলেজের জেনোমিকস সেন্টারে কাজ করেন প্রফেসার ব্রায়ান লেনক্স। একটা সময় অ্যালজাইমার নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কী কারণে অ্যালজাইমার হয়, কেন অ্যালজাইমার পেশেন্টদের সংখ্যা ইদানীং এত বেড়েছে, সেসব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে জেনোম সিকোয়েন্স নিয়ে ইন্টারেস্টেড হয়ে যান। কোন জিন এর জন্য দায়ী সেটা যদি জানা যায় তাহলে অ্যালজাইমারের মতো অসুখের চিকিৎসা সম্ভব হবে। কিন্তু সে গবেষণা করতে গিয়ে উনি অন্য একটা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বিজ্ঞানীরা জানেন, একটা লোকের বুদ্ধিমত্তা বা আই কিউ-এর রহস্যের অনেকটাই জিনগত। অর্থাৎ একটা ছেলে বা মেয়ে কতটা বুদ্ধিমান হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে তার বাবা ও মা কতটা বুদ্ধিমান তার উপরে। কিন্তু কী সেই জিন যা মানুষকে বুদ্ধিমান করে তোলে?

দেখেন প্রায় পাঁচশোর বেশি জিন এর পিছনে দায়ী। কিন্তু বিশেষ একটা জিন IGF2R-এর একটা বড় ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ জিন এডিটিং টেকনোলজির সাহায্যে এই জিনে পরিবর্তন এনে কাউকে বেশি বুদ্ধিমান করে তোলা সম্ভব। এ বিষয় নিয়েই ওঁর গবেষণা। এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছেন।

একটা প্রাইভেট ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। মূল উদ্দেশ্য ভ্রূণ স্তরে জিনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা যাতে বুদ্ধিমান শিশু তৈরি করা যায়। বলা যায় প্রায় প্রত্যেক পিতামাতাই চান যে তাদের সন্তান বুদ্ধিমান হোক। কিন্তু সবাইকে তো সে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সামান্য কয়েকজনকে আকাশছোঁয়া মূল্যের বিনিময়ে এ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার সন্ধেবেলা। খানিকক্ষণ হল পাব থেকে ফিরেছেন। এই একটা দিন পুরনো কিছু বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, আড্ডা হয়। এরকম ঝকঝকে আকাশ আর রোদের দেখা লন্ডনে আর ক'দিন মেলে। তাই আড্ডাটা আজ একটু বেশি হয়েছে।

হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজ পেলেন। টালমাটাল অবস্থায় বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বাইরে কেউ নেই।

খেয়াল করলেন পার্সেলে কিছু একটা এসেছে। ঘরের বাইরে রাখা আছে। এরকম কোনও পার্সেল তো আসার কথা ছিল না!

কার কাছ থেকে আসতে পারে?

উপরে প্রেরকের নাম, ঠিকানা লেখা আছে। ডেভিড কো। নামটা তো চেনা লাগছে না। ইয়র্কশায়ার থেকে চিঠিটা এসেছে। ছোটবেলায় বেশ খানিকটা সময় ইয়র্কশায়ারে কাটিয়েছেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ডেভিড বলে এক বন্ধু ছিল বটে। কিন্তু তার পদবী তো অন্য কিছু ছিল। যাই হোক, এ নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই!

উৎসাহের চোটে বেশি কিছু না ভেবে পার্সেল খুলতে গেলেন প্রফেসার ব্রায়ান।

আর তখনই বিস্ফোরণ হল। সে আওয়াজ বেশ কিছুদূর থেকে শোনা গিয়েছিল।

১০

এবারে পার্সেল বম্ব।

মাইক আবার অনিলিখাকে ডেকেছে। এবারে বাকিংহ্যাম প্যালেসের কাছে একটা বাড়িতে। প্যালেস স্ট্রিটে। শহরের সবথেকে অভিজাত এলাকায়। পাশেই সেন্ট জেমস পার্ক। বাইরে থেকে দেখে অত্যন্ত উচ্চবিত্তদের জন্য কোনও ফ্ল্যাট বলে মনে হবে। কিন্তু এরকম বেশ কিছু ফ্ল্যাট বা বাড়ি MI6 ভাড়া নেয়। সেরকমই একটা ফ্ল্যাটে মাইক আবার অনিলিখার মুখোমুখি।

—আজকের কাগজে খবরটা পড়েছেন নিশ্চয়? এটা যে টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি এ নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। আমরা নার্ভ এজেন্ট নিয়ে রিসার্চ করছিলাম, ভাবছিলাম পরেরটাও সেরকমই হবে, আর এক্ষেত্রে দেখা গেল নার্ভ এজেন্ট ব্যবহার না করে, ব্যবহার করেছে হাতে তৈরি শক্তিশালী পার্সেল বোমা। একটু থেমে

মাইক ফের বলে উঠল,—তবে একই লোক তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনার অনুমানই ঠিক। এবারে একটা স্কোয়ারের মধ্যে কাটা দাগ। অর্থাৎ পাঁচ নম্বর। ঠিক একইভাবে একটা কাগজ ফেলে গেছে। এছাড়াও একটা জিনিস পাওয়া গেছে কাছের একটা দেওয়ালে।

একটা তারিখ আর সংখ্যা। আমাদের ক্যামেরায় তোলা ছবিটা দেখাচ্ছি।

বলে ছবিটা বড় করে দেখাল।

25 × 6 × 18

302700

এর অর্থ কী? তারিখের দিন, মাস, বছর গুণ করে কী লাভ!—অনিলিখা অবাক হয়ে বলে উঠল।

—সেটাই তো?

—তা এটা যে ওই খুনের সঙ্গে রিলেটেড কী করে বুঝছেন?

—এর কারণ আগের খুনটাতেও অর্থাৎ মাইকেল থাম-এর খুনেও ঠিক এরকমভাবে একটা তারিখ লেখা ছিল। সেদিনের তারিখ আর গুণ। তার আগে বাকি খুনগুলোতে এরকম ছিল না।

—আগের খুনটা কোন দিনে হয়েছিল যেন?

—২০ জুন। লেখা ছিল—

20 × 6 × 2018

242160

—তা আপনি তো আগে এর কথা বলেননি?

—আগের বার ভেবেছিলাম ওটা অন্য কেউ লিখেছে। ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তাই গুরুত্ব দিইনি।

—এর আগের খুনটা কি ১৫ই জুন হয়েছিল?

—হ্যাঁ। ঠিক তাই। তবে তার আগের দুটো খুন সে হিসেবে হয়নি। প্রথম খুন হয়েছে এর বাইশ দিন আগে। আপনি যা ভাবছেন, আমরাও তাই ভেবেছি। লোকটা প্রত্যেকবার খুন করবে সেই দিনে, যার ক্ষেত্রে দিন, মাস আর বছর গুণ করলে একটা শূন্য থাকে শেষে। তাই তো? অর্থাৎ পরের খুন করবে ৩০ জুন।

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক। একটা প্যাটার্ন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে পুরো হিসেব মিলছে না। এর জন্য গুণ করে দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আগস্ট অব্দি প্রতি পাঁচ দিন বাদে বাদে খুন করলেই হবে। একমাত্র ৩০শে জুলাই এর পরে ৫ আগস্ট—ছ'দিন বাদে এমন একটা তারিখ আসবে যার তিনটে সংখ্যা গুণের পরে গুণফলের শেষ অংক শূন্য হবে।

—আমরাও তাই কনফিউসড। মনে হচ্ছে লোকটা পাগলাটে হতে পারে। অথবা আমাদের ইনভেস্টিগেশনকে ভুল দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হয়তো ৩০-এর বদলে ২৯-এ পরের খুনটা করতে পারে।

একটা কথা ঠিক। লোকটা অংক নিয়ে খুব আগ্রহী বলতে হবে।—বলে অনিলিখা একটু থামল।

—আগের ছবিটা আছে কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখাচ্ছি।

অনিলিখা খুব খুঁটিয়ে ছবিটা দেখল। তাড়াহুড়ো করে পেন্সিলে লেখা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

20 × 6 × 2018

242160

পরিষ্কার একই রকম হাতের লেখা।

একটু থেমে অনিলিখা বলে উঠল,—অপরাধীর একটা প্রোফাইল পাওয়া যাচ্ছে এর থেকে।

—ঠিক তাই। এক—সাউথ আমেরিকান, দুই—অঙ্কে আগ্রহী।

—শুধু অঙ্কে নয়, ভেদিক ম্যাথসে।

—মানে? সেটা আবার কীরকম?

—দাঁড়ান, বলার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করি। বলুন তো ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের গুণফল কত হবে?

মাইক একটু অবাক হয়ে ফোনটা বার করতে গেল।

—না ফোনে গুণ করলে চলবে না। কাগজে লিখে করুন।

আরও অবাক হয়ে মাইক টেবিলের উপরে পড়ে থাকা প্যাডের উপরে লিখল।

$30 \times 6 = 180$

2018×180

—ব্যস, আর করতে হবে না। একটা জিনিস বুঝতে পারলেন যে আপনি একবারে একলাইনে তিনটে সংখ্যাকে গুণ করতে পারতেন না, যেটা এক্ষেত্রে খুনি করেছে। এটা ভেদিক ম্যাথসে সম্ভব হয়।

—দারুণ পয়েন্ট। আমরা এটা ভাবিনি। খুনির কাছে এ ধরনের ক্ষেত্রে ফোন থাকে না। জিপিএস ট্র্যাকিং যাতে কোনওভাবে সম্ভব না হয়, তার জন্য লোকটা নিশ্চয়ই ফোন সঙ্গে রাখেনি। লোকেশন সার্ভিস অফ থাকলেও আমরা ঠিক খোঁজ পেয়ে যেতাম ওই এলাকায় ওই সময় কার কাছে কী ফোন ছিল। ফোন থাকলেও সুইচড অফ ছিল। আর ক্যালকুলেটর নিয়ে ও নিশ্চয়ই ঘুরছিল না। সে ক্ষেত্রে নিজেই ভেবে গুণ করেছে।

অনিলিখা বলে উঠল—ঠিক তাই। ভেদিক ম্যাথস-এর বিষয়টা একটু পড়ে নেবেন। যারা ভেদিক ম্যাথস জানে, তারা এভাবেই এক লাইনের মধ্যে উত্তর লিখে ফেলতে পারে আর এটা খুব তাড়াতাড়ি করাও সম্ভব। তাছাড়া, ঠিক যেভাবে ভেদিক ম্যাথসে উত্তর বার করা হয়, এখানেও ঠিক সে ভাবেই উত্তর লেখা হয়েছে। অর্থাৎ খুনি ভেদিক ম্যাথস জানে, তার সম্ভাবনা প্রবল।

—ঠিক। দারুণ একটা পয়েন্ট পাওয়া গেল। আমরা আরও বেশ কয়েকটা বিষয়ের কথা ভেবে খুনির প্রোফইল বার করেছি। খুব সাবধানী লোক। কোনও ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। আশেপাশের সিসি টিভিতেও সন্দেহজনক কোনও ছবি ধরা পড়েনি। তবে লোকটা যে উচ্চতায় দেওয়ালের উপরে লিখেছে, প্রায় কারুর নজরে পড়েনি, তাতে মাঝারি হাইটের ও মাঝ বয়সি হওয়ার সম্ভাবনা। এরকম আরও বেশ কিছু পয়েন্ট পাওয়া গেছে। আচ্ছা, বিষয়টা কী বললেন? ভেদিক ম্যাথস। তাই তো?

—হ্যাঁ, ওই বিষয়ে বই খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন। আজ আমাকে এবারে বেরোতেই হবে।—অনিলিখা উঠে দাঁড়াল। মাঝে এক ঘণ্টা সময় ছিল। এখন আবার অফিসে ফিরতে হবে।

—আপনার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ।—মাইক উঠে দাঁড়িয়ে দরজা অব্দি অনিলিখাকে এগিয়ে দিল। এই বাঙালি মহিলাটি প্রবলেম সলভিং-এর দিক দিয়ে যে অনেক এজেন্টের থেকে এগিয়ে আছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

১১

আমি এখন গ্রেড এইটে পড়ি। সবাই এখনও আমাকে একটু এড়িয়ে চলে। কেন জানি না। আমি তো কারুর কোনও ক্ষতি করিনি। এটা ঠিক যে আমার কারুর সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে না। খেলতে ভালো লাগে না।

তার থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে-শুয়ে থাকতে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। মাঠের মধ্যে দিয়ে খালি পায়ে দৌড়তে ভালো লাগে। নদীর জলে পা ভিজিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে।

মাঝেমধ্যেই রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। কেন জানি না। সেদিনও রাতে ঘুম ভেঙে গেল। কেউ কি আমাকে ডাকতে এসেছে! মা কি কাউকে পাঠিয়েছে আমাকে কাছে ডেকে নিতে? মনে হল দরজার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে।

কী মনে হল জানি না! বেশ শীত পড়েছিল। তার মধ্যে কোনওরকমে গায়ে একটা সোয়েটার পরে বেরিয়ে এলাম। কেউ নেই। তবু মন বলল, এগিয়ে যাই। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে ঘন কুয়াশা। ঠান্ডায় কাঁপছি। তবু তার মধ্যে কে যেন আমাকে ডানদিকে এগিয়ে যেতে বলল। আমি এগিয়ে গেলাম। তার পরে খানিকবাদে আবার যেন বাঁদিকের গলি দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল। মনে হল কোন পথ দিয়ে নীচের শহরটাতে যেতে হয় তা যেন কে বলে দিচ্ছে।

রাস্তায় তখন প্রায় কোনও লোক ছিল না। থাকবেই বা কী করে! এই হাঁড়কাঁপানো শীতে কে বাইরে যায়!

এর মধ্যে আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। কতক্ষণ হাঁটছিলাম ঠিক জানি না। তা ঘণ্টা-দেড়েক তো বটেই। সোয়েটার-জামা-প্যান্ট ভিজে সপসপ করছে।

একটা জায়গায় মেট্রোর কাজ হচ্ছিল। তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। একটা জায়গায় লাল ফিতে দিয়ে পথ বন্ধ করা আছে। লেখা আছে কাজ হচ্ছে বলে। কেন জানি না মনে হল এই পথে আগে যেন কোনওদিন এসেছি। এগিয়ে গেলাম।

খানিকবাদে একটা সিঁড়ি পড়ল। খুব সরু সিঁড়ি। তার উপরে জল পড়ে পড়ে বেশ পিচ্ছিল হয়ে গেছে। বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে। নীচে একটা প্ল্যাটফর্ম। পরিত্যক্ত। মনে আছে এখানেই এসেছিলাম। প্ল্যাটফর্মে আলো জ্বলছে। এই লাইন দিয়ে কোনও ট্রেন যায় না। এটা লন্ডনের বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা মেট্রোর স্টেশন। মনে পড়ল এই লাইন ধরেই মা'র সঙ্গে হেঁটে গিয়েছিলাম অনেকটা পথ। তারপর সেই সুড়ঙ্গটা পড়ে। কিন্তু সামনের লাইন এতটাই অন্ধকার আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। পরে আরেকদিন টর্চ নিয়ে এসে যাব।

আমাকে কে এখানে নিয়ে এল? সামনে তো কাউকে দেখিনি?

মা বলত সব প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া যায় না।

আপাতত জায়গাটা মনে রেখে দিয়েছি। আর ভুলে যাব না।

১২

চিঠিটা যার উদ্দেশে লেখা তার হাতে কি কোনওদিন পৌঁছবে?

চিঠিটা নিয়ে অনিলিখা আবার পড়তে শুরু করল। কতবার পড়েছে। হয়তো এ চিঠি পড়ার কোনও অধিকার ওর ছিল না। কিন্তু এ চিঠি না পড়লে এ চিঠি পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব অনিলিখা নিজে বুঝতে পারত না। তাগিদও থাকত না।

হয়তো তিনি এখনও বেঁচে আছেন। হয়তো এখনও তাঁর পরিবার এ চিঠির অপেক্ষায় আছে। মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে যখন কেউ তার পরিবারকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখে, তখন চিঠি হয়তো এরকমই হয়। শব্দ জীবন আর মৃত্যুর দূরত্ব মুছে দেয়। যে চিঠি লেখে, সে জানে সেই চিঠিই হয়তো শেষ চিঠি। প্রেরক হয়তো জানত এ চিঠি পৌঁছবে না, কিন্তু কোনওদিন হারিয়ে যাবে না।

বড় চিঠি। একদিকে ইতিহাসের মূল্যবান দলিলও বটে। আবার চিঠির কিছু অংশে চোখ বোলাল অনিলিখা।

তোমাকে একটা কথা আগে জানাইনি। সে ঘটনাকে আমি কোনওদিন পিছনে ফেলে আসতে পারিনি। অনেক দিন পর অব্দি দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতে উঠে বসে থাকতাম। একটা অদ্ভুত অপরাধবোধে ভুগছিলাম। জানি না যেখানে শত্রুকে যে-কোনও শর্তে শেষ করে দেওয়াই যে-কোনও সেনার লক্ষ্য, সেখানে এই অপরাধবোধ কেন হয়েছিল!

আমাকে কিছু দিন ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল 'স্পেশাল অপারেশনস এক্সিকিউটিভ' বা 'এসওই'-তে।

সেটা তখন ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি। আমি তখন ফ্রান্সের জার্মান অধিকৃত 'অ্যাঞ্জারস' এরিয়াতে ছিলাম। তখন ফুলের সময়। আমি মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তোমার জন্য ভালো ফুল দেখলে কুড়িয়ে রাখতাম। কেন জানি না ক'দিন বাদে শুকিয়ে গেলে মন খারাপ হয়ে যেত। বুঝতে পারতাম সময়টা ফুলের মতোই হারিয়ে ফেললাম।

ওসব জায়গায় তেমন কোনও ফ্রেঞ্চ প্রতিরোধ ছিল না। তবু জার্মান সেনাদের আরও আগ্রাসনের গতি কমাতে, সাধ্যমতো বাধা দিতে আমার মতো ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্সের ও আর্মির কিছু লোক ফ্রেঞ্চ প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করত। একে বলা হতো 'রেসিস্টান্স মুভমেন্ট'।

আগে এটা চিঠিতে লেখার উপায় ছিল না। এখন তা লেখা যায়। তা তখনই এ ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। ওটাই ছিল আমার পরিচয়। একদিন ক্যাফেতে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল। সে প্রতিরোধ বাহিনীকে নানান দরকারি তথ্য দেয়। তার কাছেই শুনলাম লেম্যান্স স্টেশনের কাছে একটা 'মুভমেন্ট কন্ট্রোল' অফিস আছে। সেখানে একটা স্টিল ড্রয়ারে খুব দরকারি ফাইল থাকে। তাতে আগামী কয়েকমাসে এপ্রান্তে কী ট্রেন আসবে, কোন ট্রেনে কী অস্ত্র থাকবে, কী ধরনের খাবার থাকবে, কোন ট্রেনে কত সেনা থাকবে তার সব তথ্য থাকে। জার্মান সেনা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে তথ্যের উপর নির্ভর করে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সেনা চলাচল থেকে সব কিছুর মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে।

লোকটা ওখানে কাজ করে। কিন্তু ফ্রেঞ্চ হওয়ার জন্য ওর স্পেশাল চেকিং হয়। ওর পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়। আমার সাহায্য চায়।

এ তথ্য আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর উপরে নির্ভর করে আমরা সেনা চলাচল ব্যাহত করতে পারি। খাবার ও ওদের অস্ত্র সাপ্লাই বন্ধ করে দিতে পারি। ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ারফোর্স এ তথ্যের উপরে নির্ভর করে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু একইসঙ্গে সে তথ্য যে আমরা জেনে গেছি তা সামান্যতম টের পেলেই ওরা প্ল্যান অন্যরকম করে দেবে।

ওই লোকটার কাছেই শুনলাম সেখানে রাতে একজন নাইট গার্ড থাকে। তার আবার খুব ব্র্যান্ডির নেশা। লোকটা এও বলল যে, ও একতলার একটা জানলার লক ভেতর থেকে খুলে রাখবে আর জানলার শাটার খুলে রাখবে যাতে বাইরে থেকে খুলে ফেলা যায়। আমি সেই জানলা দিয়ে ঢুকতে পারি। কোথায় ফাইল আছে ভালো করে বুঝিয়ে দিল।

লোকটা কেন নিজে করতে পারবে না জিগ্যেস করতে বলল, ফ্রেঞ্চ লোকদের বিশেষ করে সার্চ করা হয়। বেরোনোর সময়। কিন্তু ঢোকার সময় করা হয় না। ঠিক হল রাতে লোকটা গার্ডকে কোথাও খানিকক্ষণের জন্যে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আমি সেসময় জানলা দিয়ে ঢুকে ফাইল নিয়ে যাব।

যে যে দরজা পেরিয়ে আমাকে ওই লকারের কাছে যেতে হবে সে দরজাগুলোর লকের মোমের ছাঁচ আমাকে ও আগে দিয়ে দেবে,

যাতে আমি তাদের চাবি তৈরি করে নিতে পারি। তাহলে লক খুলে ভেতরের দরজাগুলো খুলতেও অসুবিধে হবে না।

আমি ওই ফাইলের সব কাগজের ছবি তুলে আবার সে রাতেই লোকটাকে ফেরত দিয়ে যাব যাতে কেউ বোঝার আগেই আবার ওই লোকটা সকালে ঠিক ওই জায়গায় ফেরত দিয়ে যেতে পারে।

কয়েকদিন পরে সব ব্যবস্থা হল। রাত এগারোটা নাগাদ একটা ভ্যানে করে ওখানে পৌঁছলাম। অন্ধকারে একটা জায়গায় লুকিয়ে থেকে দরজার দিকে লক্ষ্য রাখলাম। খানিকবাদে আমার চেনা সেই কন্টাক্ট ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে আড্ডা দিতে শুরু করল। লক্ষ্য করলাম, ওরা দুজনে বাইরের দরজা বন্ধ করে গল্প করতে করতে পাশের একটা দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।

আমিও সেই ফাঁকে আস্তে আস্তে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম। বুকের ধুকপুকুনি হঠাৎ করে বেড়ে গেল। এটা কোনও ট্র্যাপ নয় তো! লোকটাকে আমি তেমন চিনি না। এরকম প্রায়শই হয়। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো ধরা পড়ে যাব। তারপর মৃত্যু বা তার থেকেও খারাপ কিছু।

তবু এগিয়ে গেলাম। দেখলাম জানলার শাটার সহজেই খুলে গেল। জানলার লকও লোকটার কথামতো খোলা ছিল। তা দিয়ে কোনও আওয়াজ না করে ঢুকে গেলাম। ঘরের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোনও আওয়াজ নেই। একহাতে ০.৪৫ ক্যালিবারের রিভলভারটা, অন্যহাতে পেন্সিল টর্চটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। চাবি থাকায় একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হল না। যে ঘরে ওই ফাইলটা থাকার কথা সে ঘরের লকও আমার তৈরি চাবি দিয়ে খুলতে অসুবিধে হল না।

আস্তে আস্তে দরজার হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে অন্ধকার ঘরটাতে ঢুকে পেন্সিল টর্চের আলো আমার পায়ের কাছে ফেললাম। তারপরে আস্তে আস্তে ওই ফাইল ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

পাশ থেকে একটা মেয়ের তীব্র কণ্ঠ পেলাম,—এক পা এগোবে না। গুলি করব।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম এক বছর কুড়ির মেয়ে। সাদা ব্লাউজ, নীল স্কার্ট। মেয়েটার হাতে রিভলভার আর সে রিভলভার আমার দিকে তাক করা। কিন্তু রিভলভারের নল অনভ্যস্ত হাতে কাঁপছে। কী হল জানি না! মুহূর্তের মধ্যে আমার রিভলভারটা দিয়ে মেয়েটাকে গুলি করলাম। মেয়েটাও গুলি করল। কিন্তু ওর গুলিটা আমার গায়ে না লেগে সিলিং এ লাগল। আমার গুলি কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সোজা মেয়েটার বাঁদিকের বুকে গিয়ে লেগেছে আর মেয়েটা ছিটকে গিয়ে ঘরের অন্যকোণে পড়েছে। সাদা ব্লাউজের উপর দিয়ে রক্তের ধারা বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফাইলটা বার করে বেরিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ কী মনে হতে মেয়েটার পাশে বসে পড়লাম। মেয়েটা বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে? চমকে উঠলাম মেয়েটার মুখ দেখে। আগে খেয়াল করে দেখার সময় পাইনি। কী নিষ্পাপ, কী সুন্দর সে মুখ। ঠিক তোমার মতো।

ওর মাথা আমার কোলের উপরে রেখে বাঁচানোর চেষ্টা করলাম। বুকের মধ্যে দিয়ে গুলি চলে গেছে।

হঠাৎ আমার ভীষণ কান্না পেল। যুদ্ধের কথা ভুলে গেলাম। মনে হল আমার খুব প্রিয়জন কাউকে যেন মেরে ফেলেছি। তখনও পাচ্ছিলাম বারুদের আর মেয়েটার জামার থেকে আসা পারফিউমের একটা মিশ্র গন্ধ। এ যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনের স্বপ্নের অনুভূতি। মাথায় এল না যে ওখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমার বিপদ হতে পারে। বন্দুকের আওয়াজ নিশ্চয়ই বাইরে গেছে। যে-কোনও সময় লোক চলে আসতে পারে।

তা অবশ্য হয়নি। কেউ আসেনি। আমি আরও কুড়ি মিনিট মেয়েটাকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করার পরে শেষে ফাইল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল তোমার মতো কাউকে খুন করে ফেলেছি।

বাকি প্ল্যান ঠিক ছিল। ভ্যান আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। তাতে করে পালিয়ে আসি। পরে ফাইলের কাগজের ছবি তুলে আমার ওই কন্টাক্টের হাতে ফেরত দিই। আমার কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট জার্মান পুলিশ খুঁজে পায়নি। ওটাকে একটা সাধারণ ডাকাতির ঘটনা বলে ভেবেছিল।

ইতিহাসে ওই মেয়েটাও থাকবে না, আমিও থাকব না, ওটা হয়তো তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ছিল না। কিন্তু আমি ওই দিনটার কথা আজও ভুলিনি। পরে জেনেছিলাম মেয়েটার নাম ছিল ম্যাথে। জার্মান পুলিশ গেস্টাপোর মতো ফ্রেঞ্চ সাধারণ পোশাকের পুলিশ মিলিস-এ (Milice)-এ ওই মেয়েটা সবে যোগ দিয়েছিল। হয়তো তাই আমাকে গুলি করতে গিয়ে ওর হাত কেঁপেছিল। মৃত্যুর খেলায় ও তখনও মাতেনি। আমাকে সামান্য হলেও মানুষ ভেবে বিশ্বাস করেছিল। আমার হাত কাঁপেনি। শুনেছিলাম ওর বন্ধু আমার ওই কন্টাক্টের থেকে প্ল্যানটার কথা শুনেছিল। কিন্তু সে জানত না যে তার বান্ধবী এই 'মিলিস'-এ সবে যোগ দিয়েছে। সে দিক দিয়ে আমার খুন করাটা ভুল হয়নি।

কিন্তু তবু ওই দিনটার কথা ভুলতে পারিনি। এখনও অনেক সময় ওই বারুদের আর পারফিউমের গন্ধ পাই। বুঝতে পারি প্রিয়জনেরা কত সহজে এই যুদ্ধে হারিয়ে যায়। প্রযুক্তির কাছে মনুষ্যত্ব, মানুষের উপর বিশ্বাস কত সহজে হারিয়ে যায়।

জার্মানরাও ওই হত্যার কথা ভুলে গিয়েছিল কিছুদিন পরে। আমি পারিনি। কারণ ওর চোখে এক মুহূর্তের জন্য হলেও তোমাকে দেখেছিলাম।

প্রফেসার অ্যান্ডি কয়েকদিনের জন্য লন্ডনে এসেছেন। মাঝেমধ্যেই আসেন। ইংল্যান্ডে জন্ম হলেও এখন আমেরিকায় থাকেন। লন্ডনের সেন্ট জেমস হোটেলে সায়েন্স কনফারেন্সে এবার ওঁর বক্তব্য—'গ্লোবাল ওয়ার্মিং—অ্যানাদার গ্রেট লাই'। সেন্ট জেমস বাকিংহ্যাম প্যালেসের কাছেই নামকরা হোটেল।

অর্থাৎ ওঁর বক্তব্য হবে যে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে না। পুরোটাই বানানো গল্প। ক্লাইমেট বা জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে আমাদের কৃতকর্ম যে কোনওভাবে দায়ী নয়, সেটাই উনি প্রমাণ করবেন। উনি যা বলবেন, তা যে আদৌ সত্যি নয় অর্থাৎ গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে হচ্ছে সেটা উনি নিজে ভালোই জানেন। কিন্তু তবু বিশেষ কারণে এই বক্তব্য।

অন্য বিজ্ঞানীদের থেকে উনি অনেক বেশি বড়লোক, অনেক বেশি স্বীকৃতিও পেয়েছেন। অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তার একটা বড় কারণ উনি আমেরিকার ম্যানুফ্যাকচারিং লবির হয়ে বহুবছর ধরেই কাজ করেন।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য দায়ী কার্বন এমিসন, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যাওয়া। সেটার নিষ্ক্রমণের পরিমাণ কমানোর জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির উপরে যথেষ্ট চাপ থাকে। কিন্তু তা কমানোর জন্য যা টেকনোলজি লাগে, যা টাকা খরচ হয়, তার থেকে অনেক কম খরচে সাধারণের মনে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায় এ ধরনের বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে। সে জন্যই অ্যান্ডির মতো বিজ্ঞানীদের কিনে রেখে দেয় এই ইন্ডাস্ট্রি।

ওঁর মতো প্রথম সারির বিজ্ঞানী যখন কিছু বলেন, তখন সবাই সেটা শোনে। এমনিতেও অনেকের এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে। তাদেরকে আরও বিভ্রান্ত করে দিতে পারলেই হল। কেউ আর এ নিয়ে শোরগোল করবে না। ম্যানুফাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন বিধিনিষেধের বাইরে থেকে যা ইচ্ছে করে যেতে পারবে।

ওঁর বক্তব্য কার্বন এমিসন নয়, এর পিছনে দায়ী আছে 'মিলানকোভিচ সাইকেল'। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের আকারের সামান্য পরিবর্তন হয়, অক্ষের সামান্য পরিবর্তন হয়। তার জন্যই এই ক্লাইমেট চেঞ্জ। এর সঙ্গে আরও কয়েকটা তথ্যের সন্নিবেশে কীভাবে গল্প বানাবেন সেটাই ভাবছিলেন উনি। হঠাৎ এর মধ্যে সেলফোনটা বেজে উঠল।

ফোনটা তুলে নিলেন। ছোটবেলার বন্ধুর ফোন। এ হোটেলেই উঠেছে। অনেকদিন আগে একসঙ্গে এক স্কুলে পড়েছেন।

কাজের মধ্যে একটু বিরক্ত হলেও না আসতে বললে অভদ্রতা হতো। এত দিন বাদে দেখার সুযোগ। ওঁর রুমে ডেকে নিলেন।

খানিকবাদে দরজায় একটা কলিং বেল বেজে উঠল।

মাঝারি চেহারার আগন্তুককে দেখে খানিকটা অবাক হলেন।

এখনও দেখে অনেক কম বয়স লাগে। খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল। সে তুলনায় তেমন কিছুই করতে পারেনি। অনেক বেশি ওর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় মিনিট পনেরো কথা বলার পরে বন্ধু উঠে দাঁড়াল।

—আজ আর বসব না, জানি তোরও অনেক ব্যস্ততা আছে। তোর জন্য একটা উপহার এনেছি, বলে একটা ছোট বাক্স এগিয়ে দিল।

—আবার আমার জন্য উপহার কেন?—বলে ছোট বাক্সটা হাতে নিল অ্যান্ডি।—এনিওয়ে থ্যাঙ্কস।

বন্ধু বেরিয়ে যেতে কৌতূহলবশত অ্যান্ডি ছোট কালো বাক্সটা খুলে ফেলল। ভেতরে একটা ভারি সুন্দর টাই পিন। কিন্তু হাতে নিতে গিয়েই কি যেন একটা হাতে বিঁধল। যেখানে লাগল, সে আঙুলটা ভালো করে দেখল। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। সামান্য লাল হয়ে গেছে।

হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে গেল। টালমাটাল অবস্থায় খাটের উপরে বসে পড়লেন প্রফেসার। কোনওরকম ফোন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কী নাম্বারে ফোন করবেন ঠিক করতে পারলেন না। ব্রেন যেন কোনও কাজ করছে না। খানিকক্ষণ নিথর হয়ে বসে রইলেন।

আস্তে আস্তে চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল।

১৪

অ্যালান কো-র ফারম হাউসটা পোর্টসমাউথে। অনেকটা জায়গা নিয়ে বড় ফার্ম হাউস। সপ্তাহের দিনগুলো অ্যালান কো সাউথ লন্ডনের একটা দামি ফ্ল্যাটে থাকেন আর শুক্রবার এখানে চলে আসেন।

বাড়ির থেকে খানিক দূরে বীচ। সময় পেলেই বীচে চলে আসেন। এখান থেকে ফ্রান্স দূর নয়। অনেক যুদ্ধের তাই সাক্ষী থেকেছে এই পোর্টসমাউথ। এখানে দু-হাজার বছর আগে রোমান ক্যাসেল তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওখানেই অনেক যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয়েছিল।

অ্যালান এক নামকরা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ কোম্পানিতে চিফ রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন। ওঁর বিষয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। তবে ওঁর এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর রাজত্ব মাইক্রোবের উপরে। আমাদের শরীরে অজস্র ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা আমাদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে সহবাস করে। আমরাও সুস্থ থাকি। এদের মধ্যে কিছু ব্যাক্টেরিয়া আছে যাদের ডিএনএ-তে সামান্য পরিবর্তন আনলে তা আমাদের আরও অনেক উপকারে আসতে পারে।

যেমন দাঁতের ক্ষয়ের সমস্যা। ডক্টর অ্যালান দেখান কীভাবে 'স্ট্রেপটোকক্কাস মিউট্যান্স' ব্যাক্টেরিয়ার ডিএনএ-তে সামান্য পরিবর্তন আনলে আর আমাদের দাঁতে ওদের বসতি গড়ার সুযোগ করে দিলে, ওরা কীভাবে আমাদের দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারে।

ওঁর গবেষণার উপরে নির্ভর করে একটা বিশেষ টুথপেস্ট তৈরি হয়েছে। এখন ওঁর গবেষণা চলছে আরেকটা বিশেষ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যার উপরে নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়ানো যেতে পারে।

এ ভাবেই জেনেটিকালি মডিফায়েড শস্যের মতো এসব মাইক্রোবের সাহায্যে আগামী দিনে তৈরি হবে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত মানুষ যারা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবে।

বাড়ির কাজের লোকটাকে বিয়ার আনতে বলেছিলেন। লোকটা টেবিলের উপরে বিয়ার রেখে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে এখন ভালো গরম পড়েছে। কিন্তু অ্যালান চড়া রোদ ভীষণ পছন্দ করেন। ইংল্যান্ডে বছরে এরকম দিন হাতে গোনা যায়।

চোখ বুজে বিয়ারে চুমুক দেওয়ার সময় মনে হল শরীরটা যেন অন্যরকম লাগছে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলেন যে লোকটা বিয়ার এগিয়ে দিয়েছে সে লোকটা ওর কাজের লোক নয়। এ লোকটাকে উনি আগে কোনওদিন দেখেননি।

—কে? কে তুমি?

বলতে বলতে শরীর কীরকম যেন করে উঠল ওঁর। কথা জড়িয়ে এল খুব দ্রুত।

ঘোলাটে চোখে দেখলেন সামনের লোকটার মুখের মধ্যে কোনও অভিব্যক্তি নেই। আরও কিছু বলার আগেই আরও গভীর ঘুমে, আরও গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।

লোকটা এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ওঁর টেবিলের উপরে রেখে দিল। তাতে ট্যালি মার্কে সপ্তম সংখ্যাটা লেখা আছে। সপ্তম শিকার।

১৫

M16 দপ্তর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই মাইকের মনে হল অনিলিখার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। মেয়েটা যে অসম্ভব বুদ্ধিমান এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ইন্টারপোলও একই তথ্য কনফার্ম করেছে। লোকটা ইংরেজ। ইংল্যান্ডে থাকে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কোনও বড় সংস্থার হয়ে কাজ করার প্রবল সম্ভাবনা। কয়েকদিন আগে সেন্ট জেমস হোটেলের খুনের থেকে পরিষ্কার, লোকটা আধুনিক প্রযুক্তি খুব ভালো বোঝে। খুব বুদ্ধিমান। কোনও সিসি টিভি ক্যামেরাতে ধরা পড়েনি।

বিশেষ করে ব্রুনোর ব্যাপারটা অনিলিখাকে জানানো দরকার। ব্রুনোর সঙ্গে অপরাধীর অনেক কিছুই মিলে যাচ্ছে।

সাতটা নাগাদ ডিনারে লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের কাছাকাছি একটা জাপানিজ সুসি রেস্টুরেন্ট-এ দেখা করল মাইক।

সামান্য সৌজন্যমূলক কিছু কথা বলার পরে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল মাইক।

—আমরা একজনকে সন্দেহ করছি। বলে ফোনটা অনিলিখার দিকে এগিয়ে দিল। একটা ছবি দেখিয়ে বলে উঠল,—এই লোকটাকে। এর নাম ব্রুনো। আমাদের অপরাধীর প্রোফাইলের সঙ্গে প্রায় পুরো মিলে গেছে। একটা নামী ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি ফার্মে কাজ করে। পেরু থেকে এখানে বারো বছর বয়সে আসে। একা থাকে। খুব ইনটেলিজেন্ট। আমাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী ভেদিক ম্যাথস জানে। এখানে একটা স্কুলে ভেদিক ম্যাথস পড়ায়। নিজের শখে। একইসঙ্গে খুব ভালো মেকানিক এরকম খবর পেয়েছি।

এক বছর একটা কেমিক্যাল কোম্পানিতেও কাজ করেছিল। তাই নার্ভ এজেন্ট বা পার্সেল বোমা তৈরি করা ওর পক্ষে সম্ভব। তা ছাড়া যখন ও এখানে এসেছিল, তখন ওর বাবা একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। রেসিস্ট ক্রাইম বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। পরে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল, তাকে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই আমাদের সরকারের উপর ওর আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক।

—তা এবারে আমাকে কী করতে হবে?

—ওর সঙ্গে দেখা করে আমাকে কিছু তথ্য জোগাড় করে দিতে হবে। আমি দেখা করতে গেলে সন্দেহ হবে। তোমাকে অবশ্যই আমরা বলে দেব কীভাবে ওর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে। ওর সঙ্গে কীভাবে কোথায় দেখা করা সম্ভব সে সব আমরাই ব্যবস্থা করে দেব। কোনও চিন্তা করো না। তোমার কোনও লাইফ রিস্ক থাকবে না। আমরা সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেব।

একটু থেমে বলে উঠল,—লোকটা খুব কম লোকের সঙ্গে মেশে। আর্ট নিয়ে বিশেষ উৎসাহী। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন আর্ট একজিবিশনে যায়। আমাদের একজন এজেন্ট আছে যে ওর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। ঠিক সময় মতো তোমায় খবর দেব। তখন তোমাকে একটু কষ্ট করে চলে আসতে হবে, যেখানে আসতে বলব।

—আমার পক্ষে কিন্তু যে কোনও সময় এ ভাবে হঠাৎ কাজের মধ্যে বেরিয়ে আসা খুব শক্ত।

মাইক হেসে বলে উঠল,—আফটার অল ইউ আর অনিলিখা।

আমরা আপনার সব অতীতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত আছি। আগে বলিনি। শুধু শুধু আমরা আপনার সাহায্য নিইনি। যাদের রক্তে রহস্যের সমাধান খুঁজে বার করার নেশা থাকে, তারা ঠিক সে সময় বার করে নিতে পারে। অল দ্য বেস্ট।

ওঠার আগে একটা ছোট ঘড়ি অনিলিখার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল। এটাতে মেসেজ আসবে।

মা যে ভুল বলত না, তা আমি বুঝেছি। এই পৃথিবীর চেনা-জানা জগতের বাইরে একটা জগৎ আছে। সে জগৎকে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়।

ওই যে লিখেছিলাম লন্ডনের নীচের শহরের কথা। সেটা সত্যি আছে। লন্ডন শহরের নীচে। কিন্তু সেখানে সবার যাওয়ার অধিকার নেই। যারা এ শহরের কথা জানে, তারাও ভয়ে যায় না। যতবার গেছে, কেউ না কেউ মারা গেছে। কেউ ফিরেছে, কিন্তু আহত হয়ে। কী হয়েছিল তা মনে করতে পারে না।

এ শহরের তলায় এক হারিয়ে যাওয়া নদীও আছে। কারকওয়েল। আমি সেখানেও গেছি।

লন্ডনে ১৩৪৮ সালে ব্ল্যাকডেথ হয়েছিল। লন্ডনের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ মারা গিয়েছিল এক-দেড় বছরের মধ্যে। প্লেগে। যারা মারা গিয়েছিল, তাদের কঙ্কাল আজও রাখা আছে। মাটির তলায়। আমি সে কঙ্কাল আর হাড়ের স্তূপও দেখেছি। ভয় পাইনি।

আমি জানি ওই মাটির তলায় আমার মাও আছে। তাই ওই সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ ঘুরে যখন ওই ভয়ের জায়গাটা আসে, আমি সেখানে বসে থাকতে ভয় পাই না। জানি মা আছে এখানে, আমাকে দেখছে। অন্ধকারের ওপার থেকে। চেনা জগতের ওপার থেকে। ওটাই তাই আমার সব থেকে প্রিয় জায়গা।

১৭

সন্ধে আটটা। অফিস থেকে বেরোবে বেরোবে করছিল অনিলিখা। হঠাৎ বিপ বিপ করে উঠল হাতঘড়িটা।

ঘড়িতে মেসেজ এসেছে। টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারি। একটা আর্ট একজিবিশন হচ্ছে। এক্ষুনি চলে আসুন। আমরা আপনার অফিস বিল্ডিং-এর নীচে আছি।

অনিলিখা অফিসের ব্যাগ অফিসে রেখে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে আসে। ব্রুনো নির্ঘাত ওখানেই আছে।

খানিকবাদে টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারি থেকে কিছুটা দূরে একটা পাথর বসানো সরু রাস্তায় কালো গাড়িটা এসে থামল। এখানে খুব কম গাড়িই এসে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এ গাড়ির সে পারমিশন আছে।

গাড়ি থেকে নামার আগে মাইক অনিলিখাকে বলে দিল,—এটা আপনার ঢোকার টিকিট। এটা মূলত সিনকোয়েচেন্তো (Cinquecento) পিরিয়ডের আর্টিস্টদের ওপরে একজিবিশন। তার মধ্যেও মূলত 'লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি'-র ছবির ওপরে একজিবিশন। কিছু ছবি ইউরোপ থেকে এই একজিবিশনের কারণে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। আপনাকে ওই সময়ের লিওনার্দোর আঁকার উপরে একটু বলে দিই। তাহলে আপনার লোকটার সঙ্গে আলাপ জমাতে সুবিধে হবে।

মুচকি হেসে বলে উঠল অনিলিখা,—না। বলতে হবে না। আমার এ বিষয়ে সামান্য পড়াশোনা আছে। ওই সময়টা অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকটা তো ইটালির চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, টিটিয়ান, হ্যান্স হলবাইন—কার কার নাম বলব। চিন্তা করতে হবে না। ঠিক কথা বলার বিষয় খুঁজে নেব।

—বাহ, আমরা ওটাই একটু ভয় পাচ্ছিলাম। আরেকটা কথা। ভেতরে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু বাইরে একটু সাবধান থাকবেন। এ ধরনের লোক খুব ডেঞ্জারাস হতে পারে। আমরা যদিও নজর রাখব।

—ঠিক আছে।অনিলিখা গাড়ি থেকে নেমে টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেল। একবার ফোনে ব্রুনোর ছবিটা দেখে নিল যাতে চিনতে অসুবিধে না হয়।

বেশ শার্প দেখতে। চোখ মুখ কাটা কাটা। চওড়া ভুরু। চওড়া কপাল। সোনালি চুল। ইনফরমেশন অনুযায়ী পাঁচ আট-এর মতো হাইট।

কাছে যেতেই বুঝল একজিবিশন পুরোপুরি সোল্ড আউট। এখন আর টিকিট কাটা যাচ্ছে না। বিশাল জায়গা জুড়ে একজিবিশন।

একটু খুঁজতেই ব্রুনোকে পাওয়া গেল। লিওনারদো দ্য ভিঞ্চি-র সেকশনে আছে। ওই সেকশনেই সবথেকে বেশি ভিড়। অবশ্য সেটাই হওয়া স্বাভাবিক। ওরকম স্তরের একজন জিনিয়াস হাজার বছরে একজন হয়। কী না ছিল লোকটা! সেরা আর্টিস্ট, সেরা আর্কিটেক্ট, নামকরা কবি ও মিউজিশিয়ান, সেরা বিজ্ঞানী।

আর সবক'টা জায়গাতেই সেরা। কী করেনি লোকটা! মানবশরীর-এর রহস্য বোঝার জন্য তিরিশের বেশি মৃতদেহ কেটে মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিখুঁত ছবি ওঁরই প্রথম আঁকা। কীভাবে মা'র গর্ভে শিশু বড় হয় তারও প্রথম সঠিক ব্যাখ্যা উনি করেন। কীটপতঙ্গ ও পাখির ওড়া দেখে উনিই প্রথম ফ্লাইং মেশিন এর নিখুঁত ধারণা করেন। প্রকৃতির সব রহস্যই প্রায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করে গেছেন। কীভাবে পাথর তৈরি হয়, আকাশে মেঘ কীভাবে হয় থেকে শুরু করে এমনকী সূর্য যে স্থির, পৃথিবী যে তাকে ঘিরে ঘুরছে, তাও উনি বলে গেছেন।

উনি বাঁ হাতে লিখতেন। যাতে ওঁর বিভিন্ন আবিষ্কার ওঁকে বিপদে না ফেলে তার জন্য উনি কাগজের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখতেন। আয়নায় দেখলে তবে ওঁর লেখা পড়া যেত। এ ধরনের জিনিয়াসরা এরকম একটু পাগলাটে হন।

আসলে প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে তাকে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করেছেন ওঁর শিল্পকর্মে।

তবে এটা লিওনার্দোকে নিয়ে ভাবার সময় নয়। এটা ব্রুনোকে নিয়ে ভাবার সময়। তাই ছবিগুলোর থেকে চোখ সরিয়ে ব্রুনোর দিকে তাকাল অনিলিখা।

একটা জায়গায় লিওনার্দোর সবথেকে নামকরা ছবি মোনালিসার অনুকরণে অন্য শিল্পী আঁকা মোনালিসার ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মোনালিসার আসল ছবিটা ফ্রান্সের বিখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়ামে আছে। এখনকার অনেক নামী শিল্পীর মোনালিসার অনুকরণে এঁকেছেন। সেখানে ব্রুনোও দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে এগিয়ে গেল অনিলিখা।

ছবিগুলো দেখে হতাশায় মাথা নাড়ছে ব্রুনো। হতাশারই ব্যাপার। কোনওটাই আসল মোনালিসার কাছাকাছি হয়নি। না হওয়ারই কথা। ওই প্রতিভার ধারেকাছে যাওয়ার মতো প্রতিভাও খুব কমজনের মধ্যে থাকে। তাই ছবি যত চেষ্টা করেই কপি করা হোক না কেন, মোনালিসা মোনালিসাই। সময়ের সব দাগ মুছে দিয়ে এখনও একটাই ওরকম ছবি সম্ভব।

—আসলে এ ছবি আঁকতে গেলে সবার আগে প্রকৃতিকে বুঝতে হয়, গভীরভাবে অনুভব করতে হয়।

ইচ্ছে করে ব্রুনো যাতে শুনতে পায় সেরকম ভাবেই বলল অনিলিখা।

অবাক হয়ে অনিলিখার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ব্রুনো বলে উঠল,—একদম ঠিক কথা। এই একই কথা আমিও ভাবছিলাম।

অনিলিখা ফের বলে উঠল,—আসলে মোনালিসার ছবির আসল রহস্য হল যতবার ওই ছবির দিকে তাকানো হয়, মনে হয় ছবিটা যেন একটু অন্যরকম। যে দেখছে তার মনের অনুভূতির রং যেন ধরা পড়ে মোনালিসার মুখে। সেই রহস্যটাই সবক'টা ছবিতে মিসিং।

—একদম তাই। তার কারণ কী জানো? লিওনার্দো ওয়াস অ্যা গ্রেট অবসারভার। প্রকৃতির সেরা সব সৃষ্টিতে একটা অস্পষ্টতা থাকে, সেটা উনি ধরতে পেরেছিলেন।

অনিলিখা সায় দিয়ে বলে ওঠে,—সেই অস্পষ্টতাই দর্শকের অনুভূতির প্রতিফলন ছবির মধ্যে তুলে ধরে। তাই কখনও মনে হয় মোনালিসার হাসিতে দুঃখের ছোঁয়া। কখনও মনে হয় কোন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে হাসিতে। এই এফেক্টটা ওঁর আবিষ্কার, যাকে বলা হয় কিনা 'স্ফুমাতো' (sfumato)। অস্পষ্ট আউটলাইনে তুলির নরম ছোঁয়ায় ছবির কিছু অংশ যেন ইচ্ছে করেই সম্পূর্ণ করা হয় না। সেই বাকি অংশ আঁকে দর্শকের মন। একটা স্বপ্নের মতো। আর চোখের কোণে, ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে থাকা সেই ছায়া, সেই

অস্পষ্টতাকে অনুকরণ করা অসম্ভব। এ ছাড়া মোনালিসার ছবির বাঁ দিকের প্রান্তরেখা ডানদিকের থেকে বেশ খানিকটা নীচে, যার জন্য অরিজিনাল ছবিতে বাঁ দিকের মুখটা ডান দিকের মুখের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা বলে মনে হয়। এটা ইচ্ছে করেই করেছিলেন লিওনার্দো আর তাই দর্শকের পজিশন অনুযায়ী ছবিটাও দেখতে অন্যরকম হয়ে যায়। সেই ম্যাজিকটাই এখানে সব কটা ছবিতে মিসিং।

—অসাধারণ বিশ্লেষণ। আপনার নাম?

—আমার নাম অনিলিখা, আপনি?

—আমার নাম ব্রুনো। আমি ছবিতে খুব আগ্রহী। তা আপনি নিশ্চয়ই খুব নামকরা কোনও শিল্পী হবেন। তা না হলে তো এরকম গভীর উপলব্ধি আসে না।

—না, না। অত্যন্ত আগ্রহী দর্শকের বেশি কিছু নই।

আরও অনেক কথা হল। অনিলিখাকে কথাটা বলতে হল না। ব্রুনোই মিনিট পাঁচেক বাদে বলে উঠল,—এই ভিড়ের মধ্যে ভালো করে কথা বলা যাচ্ছে না। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে আমরা সামনের ক্যাফেতে গিয়ে কথা বলতে পারি। অবশ্যই যদি আপনার সময় থাকে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল অনিলিখা,—ঠিক আছে। আমার হাতে একঘণ্টা আছে। চলুন কোনও ক্যাফেতে যাওয়া যাক।

১৮

বাড়িতে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ বাদেই মাইকের ফোন।

—কীরকম দেখলেন?

—ব্রুনো খুব শার্প। অনেক খবরাখবর রাখে। দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো। আমি যে কালির পেন ব্যবহার করি তা আমার আঙুলে কালির অস্পষ্ট দাগ থেকে বুঝে গেছে। একইসঙ্গে আমি এদেশে না থাকলেও যে নিয়মিত আসি তাও বুঝতে পেরেছে। ব্রিটিশ সরকারের উপর যথেষ্ট রাগ আছে। লোকটা একটা সময় আদর্শগত দিক দিয়ে কমিউনিস্টদের সাপোর্ট করত। তারপরে বিভিন্ন কারণে ও এখানকার সরকারকে রীতিমতো ঘৃণা করে।

তাছাড়া, দুটো বড় ক্লু-ও মিলে গেছে। যেরকম বলেছিলেন, ভেদিক ম্যাথসে লোকটার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। ভেদিক ম্যাথসের ষোলোটা সূত্র পরপর বলে গেল। কীভাবে এর সাহায্যে আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশে মুনি-ঋষিরা কাজ করত, কীভাবে এ সূত্রগুলো ভাবা হয়েছিল—সে বিষয়েও গভীর জ্ঞান আছে। স্বামী কৃষ্ণতীর্থ যিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভেদিক ম্যাথসকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করেন, তার পুরো কাজের সঙ্গে উনি সম্পূর্ণ পরিচিত।

—এ তো সাংঘাতিক খবর। এর পরেও সন্দেহ করব না! এরকম হাতে গোনা ক'জন থাকতে পারে।

—অন্য ক্লুটাও মিলে গেছে। কথায় কথায় আমি জেনে নিয়েছি যে, দক্ষিণ আমেরিকার ওই স্টাইলের ট্যালি মার্কের সঙ্গে লোকটা যথেষ্ট পরিচিত।

—মাই গড। তাহলে তো মনে হচ্ছে এখনই অ্যারেস্ট করলে ভালো হয়।

—আমার মনে হয় ওকে আরেকটা এরকম ধরনের কাজ করার সুযোগ দিয়ে দেখতে হবে লোকটা কী করে।

—এর পরেও? আমরা কিন্তু ওকে অনেক সহজে সরিয়ে ফেলতে পারি। কেউ জানতেও পারবে না।

—না না। সেটা ঠিক হবে না। শুধু সন্দেহের বশে কিছু করা ঠিক হবে না। তার থেকে ওকে একটা এরকম সুযোগ দিয়ে দেখা দরকার কী করে।

—কিন্তু কাকে টার্গেট করছে তা আমরা জানব কী করে?

হেসে উঠল অনিলিখা।—তার থেকে টার্গেটকেই যদি ওর হাতের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়।

—ভালো আইডিয়া। কিন্তু কাকে মারার ব্যাপারে ও বেশি আগ্রহী হবে সেটা জানব কী করে? অবশ্য একটা টারগেট প্রোফাইল তৈরি আছে আমাদের।

—বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত আছে, ও সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে কিছু কাজ করছে, এরকম কিছু হাই-প্রোফাইল লোকের সামনে ওকে আসার সুযোগ করে দিতে হবে। যারা খুন হয়েছে, তাদের মধ্যে আর কিছু মিল পাওয়া গেছে?

—একটা মিল আছে। এরা প্রত্যেকেই এমন কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত যাতে মানবিকতার দিক থেকে কিছু প্রশ্নচিহ্ন আছে।

—হ্যাঁ, আমারও সেরকম মনে হয়েছে। যেমন আপনি জানেন কিনা জানি না, ন্যাকো কোয়ান্টাম কম্পিউটার বার করলেও এখন যে প্রোজেক্টে ওই কম্পিউটার ব্যবহার করার কথা ভাবছিলেন, সেটা একেবারে ঠিক নয়। একটা নামী ইনসিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে উনি চুক্তি করেছিলেন যেখানে ডিএনএ প্রোফাইলের উপরে নির্ভর করে ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম ঠিক করা হবে। অর্থাৎ যদি দেখা যায় কারুর মধ্যে অ্যালজাইমার হওয়ার জিনগত দিক দিয়ে প্রবণতা আছে, সেক্ষেত্রে তাকে হেলথ ইনসিওরেন্স অনেক বেশি দিতে হবে।

হয়তো তিনি পাবেনই না। সেই কাজে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য চুক্তি করেছিলেন ন্যাকো।

—তা এতে খারাপ কী আছে?

—অবশ্যই এর আসল উদ্দেশ্য খুব খারাপ। এরকমও হতে পারে যে যদি কারুর খুব খারাপ কোনও অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে কোনওভাবে কোনওদিন স্বাস্থ্যবিমা পাবে না। তা, যা বলছিলাম।

সেদিক দিয়েও ভেবে আমাদের উপযুক্ত লোক খুঁজে বার করতে হবে যাকে খুন করতে ওঁর আগ্রহ থাকতে পারে। অবশ্যই ইতিমধ্যে ব্রুনোর উপর কড়া নজরদারি রাখতে হবে।

—হ্যাঁ, সে তো বটেই। আমরা ওর প্রত্যেকটা মুভমেন্টের উপর নজর রাখব। দরকার মতো আপনাকে আবার যেতে হবে।

—সে ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো এখানে অন্য কাজে এসেছি। আমার পক্ষে যখন তখন সেটা করা সম্ভব হবে না।

—হ্যাঁ, তা জানি। আচ্ছা, একটা ভালো খবর দিই। আপনি যার খবর চেয়েছিলেন, আমরা তার খবর পেয়েছি। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ঠিক তাকে খুঁজে বার করে ফেলেছে।

উত্তেজিত হয়ে উঠল অনিলিখা,—ওই লিজা জেমসকে লেখা চিঠির কথা বলছেন? ওঁর বয়স তো বেঁচে থাকলে এখন আশির উপরে হবে।

—না না, ওঁর কোনও খোঁজ পাইনি। তিনি অনেক বছর আগেই মারা গেছেন। আপনি যেটা শুনেছেন সেটাই ঠিক। তবে আমরা তার ছেলেকে ট্র্যাক করতে পেরেছি। ওখান থেকে চলে এসে রেডিং-এর একটা নামী গ্রামার স্কুলে পড়ত। ছেলেটা নাকি পড়াশোনাতে খুব ভালো ছিল। খুব ভালো রেজাল্ট করে অক্সফোর্ডে ঢোকে। তারপরে দীর্ঘদিন ওখানে অঙ্ক পড়াত। বেশ কয়েকবছর হল রিটায়ার করেছে। আপনাকে ঠিকানাটা দিচ্ছি। মাইক ঠিকানাটা দিয়ে দেয়।

—অনেক ধন্যবাদ মাইক। খুব বড় উপকার করলে। ওই চিঠিটা না পৌঁছতে পারলে খুব আফশোশ থেকে যেত। মনে হতো এখানে আসাটাই অপূর্ণ থেকে যেত।

—এ তো আমাদের কাছে খুব সোজা কাজ। তবে তার থেকে অনেক শক্ত কাজে আপনি আমাদের সাহায্য করছেন। এটুকু উপকার করব না! গুড নাইট।

অনেক রাত হয়েছে। কাল আবার অফিস।

ব্রুনোর কথা মনে হচ্ছে। যে এত শিল্প ভালোবাসে, সে লোকটা এরকম খুনি হতে পারে? হয়তো পারে। ভালো ছবির মতো সব মানুষের চরিত্রের মধ্যেই একটা অস্পষ্টতা থাকে। সব কিছু আগে থেকে বোঝা যায় না।

১৯

১২, কুইন্স ক্লোস। এটন সোকন। ছোট গ্রাম। আউস নদীর ধারে। কেম্ব্রিজশায়ার ও বেডফোর্ডশায়ারের বর্ডারে। সামান্য কিছু লোকের বাস। তাদের বেশিরভাগই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। আসলে এখান থেকে বড় শহরগুলোর যোগাযোগ ভালো নয়। কাছাকাছি সেরকম কোনও ইন্ডাস্ট্রিও গড়ে ওঠেনি। চারদিকে শুধু নিখাদ পরিবেশ। নদী, আর জঙ্গল। খোলা মাঠ আর নীল আকাশে হারিয়ে যাওয়া উপত্যকা।

গাড়ি নিয়েও ডেভের বাড়ি খুঁজতে অনেক সময় লেগে গেল অনিলিখার।

খুব উত্তেজনা হচ্ছিল অনিলিখার। শেষ পর্যন্ত দিতে পারবে তো সেই চিঠি! একটা চিঠির সূত্রেই কীরকম যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে এদের সঙ্গে। বাড়িতে কেউ থাকবে তো?

একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। লাল টালির ছাদ। সামনে বড় বাগান। তার মধ্যে দিয়ে সুড়কি ফেলা পথ। সেটা পেরিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনিলিখা একটু অবাক হল। কোনও কলিংবেল নেই। বাধ্য হল দরজায় ধাক্কা দিতে।

খানিকবাদে এক বছর চল্লিশের লোক দরজা খুলে দিল। দেখে বেশ ভদ্র মনে হয়।

—ডেভ বাড়িতে আছেন?

—হ্যাঁ। আপনার নাম?

—আমার নাম অনিলিখা। উনি আমাকে চিনবেন না। আসলে আমার কাছে ওঁর মোবাইলের নাম্বার ছিল না। তাই সরাসরি চলে আসতে হয়েছে।

—এমনিতেও তো ওঁর কোনও সেলফোন নেই। বাড়িতে কোনও ফোন নেই। আপনি ভেতরে চলে আসুন।

ভেতরে এসে বসল অনিলিখা। একটা সাধারণ ড্রয়িং রুম। তাতে একটা দিক জুড়ে বইয়ের আলমারি। অন্যদিকে একটা পিয়ানো। একটা বিশাল গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক। দেওয়াল জুড়ে ফুল আর গাছের ছবি।

মিনিট পাঁচেক বাদে ডেভ এসে ঢুকলেন। দেখে বোঝাই যায় না ওঁর এতো বয়স হয়েছে। মনে হয় ষাটের কোঠায়। চোখে ভারী গোল ফ্রেমের চশমা। মাথা ভর্তি সোনালি চুল। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারা। দেখেই প্রফেসার মানুষ মনে হয়। শ্রদ্ধাবোধ হয়।

অনিলিখা উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বলে উঠল,—একটা দরকারে এসেছি। আপনাকে একটা অত্যন্ত দরকারি চিঠি দেওয়ার আছে।

চিঠি? আমার নামে?—ভারী গলায় আস্তে আস্তে বলে উঠলেন প্রফেসার।

—না, এটা আপনার মায়ের নামে। খুব সম্ভবত আপনার বাবার লেখা। আমি খুব দুঃখিত যে লেখাটা আমি পড়েছি। আর পড়েছি বলেই এর মূল্য বুঝতে পেরেছি।

ভদ্রলোক যেন কথাটা শুনে চমকে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে কাঁপা হাতে চিঠিটা নিয়ে সামনের সোফায় বসে পড়লেন। চুপ করে পড়তে লাগলেন। মাঝে একবার যেন চশমা খুলে চোখ মুছলেন। একবার পুরো পড়ার পরে আবার দ্বিতীয় বার পড়লেন।

দ্বিতীয় বার পড়ার পর ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে অনিলিখার দিকে এগিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ কিছু বলতে পারলেন না। অনেক কষ্টে আবেগ সামলে শেষে বলে উঠলেন,—তুমি যে কী উপকার করলে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আমি প্রাণ দিয়েও তোমার এই ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারব না। এ চিঠি যে আমাদের কাছে কত মূল্যবান তা বোঝানোর কোনও ভাষা আমার কাছে নেই। এটুকু বলতে পারি আমার মা সারাজীবন কাটিয়েছেন এ চিঠির অপেক্ষায়। তারপরে হয়তো আমি। আমার জীবন অন্যরকম হতে পারত যদি এই চিঠিটা সময় মতো আমাদের কাছে এসে পৌঁছত। তা এটা কোথা থেকে পেলে?

অনিলিখা বলে উঠল কীভাবে বইয়ের মধ্যে চিঠিটা কলকাতায় পেয়েছে।

—কলকাতায়? কলকাতায় কী করে গেল? একটু থেমে ডেভ ফের বলে উঠলেন,—মনে হয় বুঝেছি। বাবার খুব বন্ধু একজন ছিলেন ভারতীয়। মায়ের মুখে শুনেছি। হয়তো তার সঙ্গে ওই চিঠি কোনওরকমে ভারতে চলে যায়। তা তুমি কোথায় থাকো? কলকাতায়?

—হ্যাঁ, আমি কলকাতায় থাকি। আমার নাম অনিলিখা। এখানে কিছুদিনের জন্য কাজে এসেছিলাম। চিঠিটা আমি অবশ্য আসার কয়েকদিন আগেই পেয়েছি।

—অনিলিখা? তোমার নাম শুনেছি মনে হচ্ছে!

অনিলিখা মুচকি হেসে উঠে বলতে যাচ্ছিল। ডেভ হেসে বলে উঠলেন,—দাঁড়াও, আমাকে ভাবতে দাও। বয়স হয়ে গেছে। মনে করতে একটু সময় লাগে। তারপরে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন,—আমি তোমার কিছু রিসার্চ পেপার ও বই পড়েছি। কিছুদিন আগেই 'ইন্টারনেট অফ থিংস'-এর উপরে তোমার একটা বই পড়েছিলাম। ঠিক তো?

অনিলিখা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

—শুধু তাই নয়, তুমি তো বেশ কিছু রহস্যও উদ্ধার করেছ। রিয়াল বিউটি উইথ দ্য ব্রেন।

ডেভ হেসে ফের বলে উঠলেন,—কলকাতায় এরকম সুন্দরী ও বড় মনের মানুষ থাকে জানলে আমি তো কবে কলকাতায় চলে যেতাম। তারপর প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠলেন।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন,—আমি অঙ্কের প্রফেসার ছিলাম অক্সফোর্ডে। আমার কাছে তোমার দেশ ভারত কিন্তু খুব প্রিয়।

—কেন? ভেদিক ম্যাথস এর জন্য? অনিলিখা বলে উঠল।

—না, না, তা নয়। ও বিষয়টা আমার তেমন জানা নেই। অন্য একটা বিষয়ের কথা বলি। সবথেকে বড় সংখ্যা, আর সব থেকে ছোট সংখ্যার ব্যবহার কিন্তু তোমার দেশেই শুরু হয়েছে। ললিতাভিস্তারা সূত্রের কথা জানা আছে?

—না, ঠিক মনে পড়ছে না।

—ওটা খুব সম্ভবত চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে লেখা। ওখানে বলা হয়েছে, বুদ্ধকে জিগ্যেস করা হয়েছিল একশো কোটির থেকে বড় কী সংখ্যা আছে। তোমরা তো কোটি বলো, তাই না?

—হ্যাঁ, দশ মিলিয়নে এক কোটি হয়।

—ঠিক, তা বুদ্ধ ওই প্রশ্নের উত্তরে বলেন এক শতকোটি-তে এক অযুত হয়। একশত অযুতে নিযুত হয়। একশত নিযুতে এক কঙ্করা হয়। একশত কঙ্করাতে এক ভিভারা হয়। বলতে বলতে উনি এক তল্লাকসনা অব্দি বলেন। তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন। উনি শেষ যে নাম্বারটা বলেন তাতে ১-এর পরে ৪২১টা শূন্য ছিল। অতবড় সংখ্যা আজও আমরা ব্যবহার করি না। ভেবে দেখো, ওই সংখ্যার ব্যবহার কিন্তু প্রাচীন ভারতে ছিল। 'শূন্য'-এর মতো আরও অনেক বিষয়ে ভারতই পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে। নাহ আর বলব না। তুমি নির্ঘাত বিরক্ত হয়ে উঠছ।

—মোটেও না। আমার বরং খুব ভালো লাগছে। কিন্তু আপনার গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকটা তো ভারি অদ্ভুত।

—ও দশটা ঘণ্টার কাঁটা আছে বলে বলছ!

—আপনি কি ঘড়িতে ডেসিম্যাল সিস্টেম ব্যবহার করেন।

—হ্যাঁ, আসলে অঙ্কের প্রফেসাররা একটু আজব টাইপের হয় বলে ফের হেসে উঠলেন। ভেবে দেখো আমরা সব ব্যাপারে ডেসিম্যাল সিস্টেম ব্যবহার করি। শুধু ঘড়ির ব্যাপারে অন্যরকম হবে কেন? কেন ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা, ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট হবে, কেনই বা ২৪ ঘণ্টায় এক দিন হবে। আমি তাই ডেসিম্যাল সিস্টেম ব্যবহার করি। আমার দিনে তাই দশ ঘণ্টা, প্রত্যেক ঘণ্টায় ১০০ মিনিট, প্রত্যেক

মিনিটে ১০০ সেকেন্ড। ফলে আমার সেকেন্ড তোমাদের সেকেন্ডের থেকে সামান্য ছোট। তোমাদের দিনে ৮৬৪০০ সেকেন্ড, আমার দিনে এক লক্ষ সেকেন্ড। শুধু ওই ঘড়িটা নয়, আমার বাড়ির সব ঘড়িই ওই নিয়মে চলে।

—আপনার স্ত্রী?

—উনি অনেকদিন মারা গেছেন। আমি আর আমার কাজের লোক এখানে থাকি। কেনকে অবশ্য শুধু কাজের লোক বললে ভুল হবে। আমার সব কাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট।

—তা আপনার সময় কাটে কী করে?

—ওই সারাদিন বাগান আর অঙ্ক নিয়ে থাকি। মাথার উপরে খোলা নীল আকাশ আর চারদিকে সবুজ থাকলে, আর কিছু লাগে না।

একটু থেমে ডেভ বলে উঠলেন,—তোমায় কিন্তু ডিনার খেয়ে যেতে হবে।

—না, না। অনেক কাজের মধ্যে এসেছি। আমাকে এক্ষুনি ফিরতে হবে। আমি পরে আরেকদিন আসব।

—ঠিক আছে। কথা দিচ্ছ যে আরেকদিন অন্তত আসবে। তোমার কাছে কিন্তু আমি চিরকালের জন্য উপকৃত হয়ে থাকলাম। মা যে কী খুশি হবেন, কী বলব!

—খুশি হবেন মানে? উনি তো আর জীবিত নেই।

—মানে ওই আর কী। আমি এখনও বিশ্বাস করি, মা এখানে কাছাকাছি কোথাও আছেন। তাই বলা আর কি!

যেতে যেতে অনিলিখা বলে উঠল,—আপনার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করতে হলে কীভাবে করব?

—এই তো বিপদে ফেললে! আমার আবার কোনও ফোন নেই!

অনিলিখা অবাক হয়ে বলে ওঠে,—কোনও ফোন নেই?

—আমাকে আর কে ফোন করবে বলো? শুধু শুধু টাকা খরচ হয়। তাই রাখিনি। এখানে আমাদের ছোট গ্রাম। আমরা সবাই সবাইকে চিনি। যা দরকার বাড়িতে গিয়েই বলি। যোগাযোগ থাকে।

—তা আপনি কি লিঙ্কডিন বা ফেসবুক বা টুইটারে আছেন?

আবার সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে বলে উঠলেন ডেভ,—আমি কি আর এ যুগের লোক যে এসব খুলে বসে থাকব। আমি এখনও সময় পেলেই বাইরে বেরিয়ে যাই। ঘরে বসে থাকি না। সাইকেলে করে নদীর ধারে চলে যাই। সেখানে কোনও কোনও দিন মাছ ধরি। হাঁসেদের খাওয়াই। আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এখনও সপ্তাহে দু'দিন ব্যাডমিন্টন খেলি। শনিবারে গ্রামের লাইব্রেরিতে বসে সেই সপ্তাহে পড়া গল্পের আলোচনা করি। এই হচ্ছে আমার জীবন। তবে আমাকে যোগাযোগ করার সবথেকে সহজ উপায় হল, এখানে চলে আসা। ঠিক পেয়ে যাবে।

—আপনি তাই এ বয়সেও এত ফিট।

—তা বলতে পারো। এখনও ম্যারাথন দৌড়োই। ভেজাল একদম পছন্দ করি না। ওই যে তোমাদের এখন হয়েছে না, মগজে চিপ বসিয়ে ঘুরছ, সেসব করার কোনওদিন দরকার হয়নি।

—মগজে চিপ? সেটা আবার কী?

—জানো না বুঝি! অবশ্য ব্যাপারটা খুব কম লোকই এখনও অব্দি জানে। এখানে একটা এলিটিস্ট সমাজ বা অন্য এক ধরনের মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সে কাণ্ডের কর্মকর্তা হলেন বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুত সংস্থার প্রধান রিচার্ড বেহনিস। আমেরিকায় থাকেন। এখানে মাঝে মধ্যে আসেন। তা উনি আর ওঁর পোষা বিজ্ঞানীরা একটা চিপ তৈরি করেছেন যা মাথায় ইমপ্লানট করলে বুদ্ধি আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে!

—হ্যাঁ, আমি এরকম সম্ভাবনার কথা শুনেছিলাম। কিন্তু সেটা যে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হবে এরকম ভাবতে পারিনি।

—আমিও জানতাম না। আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন নামকরা ফিজিসিস্ট আছেন, তাদের মুখেই শুনলাম। এরকম নাকি অলরেডি হাজার দশেক লোক আছে, যারা আমাদের মতোই, শুধু উপরে ওঠার সিঁড়ি তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য এই ইমপ্লয়ন্টের সাহায্য নিয়েছে। এই চিপের মাধ্যমে ব্রেনের কিছু অংশে নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রিক ইম্পালস পাঠানো হয় যাতে স্মৃতিশক্তি প্রায় দু-গুণ বেড়ে যায়, দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা দশগুন বেড়ে যায়।

—তা আপনার ভয়টা কোথায়?

—এ তো প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ। ভাবো তো তোমাকে যদি এরকম একটা লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। পারবে? কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ?

—রিচার্ড ইংল্যান্ডে আসছেন পরের সপ্তাহে। সেটা জানেন তো?

—হ্যাঁ শুনেছি। ওঁর একটা বিশাল খামার বাড়ি আছে কেন্টের ক্যানটারবেরীতে। ২০ একরের ওপরে বিশাল বাড়ি।

ওখানেই থাকবে হয়তো এসে। আমি অবশ্য অত বড়লোকেদের খবর রাখি না, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি আদর্শ না থাকে।

অনিলিখা আর বেশিক্ষণ ছিল না। এরকম প্রাণখোলা মানুষ খুব কম দেখা যায়।

যাক, চিঠি অন্তত ঠিক লোকের কাছে পৌঁছেছে এত বছর বাদে।

২০

আবার ব্রুনোর সঙ্গে দেখা। এবারে লন্ডনের কোর্টফিল্ড রোডের একটা নামী ভারতীয় রেস্টুরেন্টে। বম্বে ব্রাসারি। ভেতরে পুরো ভারতীয় পরিবেশ। ভেতরে হালকা সেতারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের ছবিতে ধরা হয়েছে ভারতের ইতিহাস।

অবশ্য এটা নিছক দেখা করার জন্য নয়। ঠিক হয়েছে রিচার্ড বেহনিস-এর লন্ডনে আসার খবরটা অনিলিখা মারফৎ ব্রুনোকে জানানো হবে। তারপরে ব্রুনোকে ট্র্যাক করা হবে। দেখা হবে ও কী করে! তাহলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ব্রুনো কম্পিউটার সায়েন্স ও ফিলোজফি নিয়ে পড়াশোনা করেছে অক্সফোর্ডে। খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল।

অনিলিখা সে প্রসঙ্গ দিয়েই গল্প শুরু করল।

—অনেকেই ভাবতে পারে না যে কম্পিউটার সায়েন্স ও ফিলোজফি একইসঙ্গে পড়া সম্ভব।

—ঠিক বলেছ। আমি ছিলাম ওই সাবজেক্টের প্রথম ব্যাচ। অনেকেই তখন ভাবতে পারত না যে এরকম একটা সাবজেক্ট কম্বিনেশন হতে পারে। কিন্তু আমার তো অভিভাবক ছিল না। তাই নিজের ইচ্ছেতেই সব কিছু ঠিক করতাম। পরে বুঝেছিলাম, কেন এই দুটো সাবজেক্ট একসঙ্গে পড়ানো হয়। কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট এর মধ্যে যদি দার্শনিকতা ও মানবতা না থাকে, তাহলে সে সমাজের সর্বনাশ করে দিতে পারে।

ব্রুনোকে উত্তেজিত করার জন্য অনিলিখা আবার বলে উঠল,—শুনলাম এখন মানুষের ব্রেনের মধ্যেও চিপ বসান হচ্ছে, আরও বুদ্ধিমান করার জন্য।

—ও তুমিও শুনেছ। ওই বদমায়েসটাকে হাতের কাছে পেলে যে কী করতাম না।

—রিচার্ড-এর কথা বলছ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—শুনলাম পরের সোমবার এখানে দু-দিনের জন্য আসছে। কেন্টে ওঁর খামার বাড়িতে।

ব্রুনোর চোখটা রাগে জ্বলে উঠল। কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। খানিকবাদে ফের বলে উঠল,—আমাদের আকাশ, বাতাস সব এসব বড়লোকদের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করতে হবে অনিলিখা।

—আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, তুমি কি প্রফেসার ডেভ জেমসকে চেনো? অক্সফোর্ডে পড়াতেন?

—আরেবাবা। চিনব না! ডেভ হলেন একজন জিনিয়াস। আমাদেরও পড়িয়েছেন। কী সুন্দর গল্প করে পড়াতেন। মনে হতো যেন অংক পড়াচ্ছেন না, স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। ওঁর কাছেই তো কম্পিউটারের বেসিক সব শেখা। ওঁর কাছেই বুঝি কীভাবে কম্পিউটার সায়েন্সের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে অংকের ওপরে। উনিই ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন আমাদের অংকের জগতকে কীভাবে কম্পিউটার তার বাইনারি ভাষায় প্রকাশ করে গণনা করে। উনিই বলেন কীভাবে বেদে ভারতীয় মুনি-ঋষিরা প্রকৃতির থেকে শিখে তাকে অংকের সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিল। উনি হলেন এক কথায় অংকের শিল্পী। কিন্তু উনি নিজেই পরে একটা সময় কম্পিউটার ও এখনকার প্রায় সব প্রযুক্তিকে দূরে সরিয়ে দেন। এখন ফোন পর্যন্ত ব্যবহার করেন না। উনি যেটা বুঝেছিলেন সেটা আমি এখন বুঝি। কীভাবে দুটো মানুষকে কাছে নিয়ে যাওয়ার জায়গায়, প্রযুক্তি কীভাবে একজন মানুষকে আরেকজন মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কীভাবে আমাদের অনুভূতির ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে।

—তা তোমার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে?

—হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে আমি ওঁর বাড়ি যাই। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনও উপায় নেই। ফোন, কম্পিউটার কিছুই নেই ওঁর কাছে। তা তুমি ওঁকে চিনলে কী করে?

অনিলিখা সংক্ষেপে চিঠির কথাটা উল্লেখ করল, অবশ্যই MI6-এর থেকে পাওয়া সাহায্যের অংশটুকু বাদ দিয়ে। ব্রুনো পুরো ব্যাপারটা শুনে বলে উঠল,—তোমার মতো মহিলা আমি সত্যি আগে দেখিনি। উনি এই চিঠিটা শুধু তোমার জন্যেই পেলেন। আমার দিকে থেকেও, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ব্রুনোর সঙ্গে কথা বলার পরে অনিলিখা যখন বম্বে ব্রাসারি থেকে বেরল,তখন রাত দশটা। রাস্তায় ল্যাম্পের আলো সবে জ্বলে উঠেছে। পাবগুলোর সামনে লোকের জটলা। লন্ডনের গ্রীষ্মের সন্ধ্যার মাদকতা এখন যেন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করছিল, লন্ডনের রাস্তায় প্রায় সবার হাতে মোবাইল,কানে হেডফোন। চারদিকে কী হচ্ছে তা কেউ যেন লক্ষ করছে না। বাইরের কোনও শব্দ কারুর কাছে যাচ্ছে না। আমরা সবাই যেন এক কৃত্রিম জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছি।

এসবের মধ্যে অনিলিখার কেন জানি মনে হচ্ছিল কোথাও একটা গন্ডগোল হচ্ছে। কী একটা খটকা ভাবতে ভাবতে ও এগিয়ে গেল আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের দিকে।

২১

ফোনটা ধরতেই উলটো দিক থেকে মাইকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—অনিলিখা, আমাদের অনুমান নির্ভুল। ব্রুনো গাড়ি করে কেন্টের দিকেই যাচ্ছে। আমাদের একজন কন্টাক্ট ওকে ফলো করছে। আমরা ইচ্ছে করে রিচার্ড-এর বাড়ির ভেতরেও যাতে সহজে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করেছি।

—ব্রুনো কি একা আছে?

—হ্যাঁ। রিচার্ড-এর বাড়ির সিকিউরিটি আমরা কমিয়ে দিয়েছি যাতে ও ঢোকার সাহস ও সুযোগ পায়।

—রিচার্ড-এর সিকিউরিটি আগে থেকে কমিয়ে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

—সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাক। আসলে খুব কড়া পাহারা থাকলে ও তো বাড়ির ভিতরে ঢুকবে না। ঢোকার পর ঠিক সময় মতো আমাদের ধরতে হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখতে হবে। তা তোমার মধ্যে একটা দ্বিধা আছে বলে মনে হচ্ছে। অন্য কিছু ভাবছ?

—না ভাবছি যদি আসল অপরাধী অন্য কেউ হয়।

—তুমি তো জানো। লোকটার প্রোফাইল, চিন্তাভাবনা একদম মিলে যাচ্ছে অপরাধীর সঙ্গে। ভেদিক ম্যাথস, সাউথ আমেরিকান ট্যালি মার্কস, প্রকৃতির প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা, শার্প মাইন্ড, মাঝারি হাইট, বয়স, নার্ভ এজেন্ট, বোমা তৈরির ক্ষমতা সব সব কিছু মিলে যাচ্ছে। চিন্তা করো না। আমরা নিশ্চিত না হয়ে ওর কিছু ক্ষতি করব না। তোমাকে সময় মতো জানাব।

—আসলে কী জানেন? আমার মনে হচ্ছে যেন খুব বেশি রকম মিলে যাচ্ছে। একটা ক্লু মেলা ভালো। এতোগুলো ক্লু মিলে যাওয়া খানিকটা অস্বাভাবিক। আর খুব সহজে যেন সে প্রমাণগুলো আমাদের চোখের সামনে চলে আসছে। সেখানেই আমার সন্দেহ।

না, তুমি একদম আমাদের মতোই হয়ে গেছ। পারফেক্ট। সবেতেই সন্দেহ—বলে হেসে উঠল মাইক। প্রথমবার মাইককে জোরে হাসতে শুনল অনিলিখা।

ফোন ছেড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবল। কাল ব্রুনোর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল কী যেন একটা কথায় খটকা লেগেছিল। পরে বাড়িতে এসে কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় ওটা নিয়ে আর ভাবার সময় পায়নি।

হঠাৎ কী একটা কথা মনে হতে ল্যাপটপ বার করে বেশ খানিকক্ষণ সার্চ করল অনিলিখা।

ঠিক যা ভেবেছিল। সন্দেহটা সত্যি। এবারে বুঝতে পারল কেন ব্রুনোর কথায় খটকা লেগেছিল। হ্যাঁ, ঠিক সেই কথাটা যেটা ব্রুনো বলেছিল ডেভ প্রসঙ্গে—

'উনিই বলেন কীভাবে বেদে মুনিঋষিরা প্রকৃতির থেকে শিখে তাকে অংকের সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিল।'

অর্থাৎ ডেভ ভেদিক ম্যাথস জানতেন।

তাহলে কেন ডেভ নিজের মুখে 'ভেদিক ম্যাথস' জানার কথা অস্বীকার করেছিলেন অনিলিখার কাছে? একইসঙ্গে উনি জানতেন যে, ব্রুনো ভেদিক ম্যাথস জানে কারণ সেটা উনিই ব্রুনোকে শিখিয়েছেন।

তাহলে কি সবাই যাতে ব্রুনোকে সন্দেহ করে, সে জন্যই উনি জোর করে ওভাবে ভেদিক ম্যাথসের প্রমাণ রেখে এসেছিলেন খুনের জায়গাতে। উনি নিশ্চয়ই জানতেন যে ব্রুনোর এ বিষয়ে আগ্রহের কথা অনেকেই জানে আর বিষয়টা ইংল্যান্ডে খুব কম লোকই জানে। একইসঙ্গে ডেভ যে কোনওরকম প্রযুক্তি পছন্দ করেন না, তার প্রমাণ ওঁর বাড়িতে গিয়েই স্বচক্ষে দেখেছে অনিলিখা।

এর পরের প্রশ্নটাই হল ডেভ কি নার্ভ এজেন্ট বা বোমা তৈরির ক্ষমতা রাখে? সেক্ষেত্রে ডেভ-এর উপরে সন্দেহটা আরও জোরদার হয়। আর তাই ইন্টারনেটে সার্চ করছিল অনিলিখা।

ইন্টারনেটে সার্চ করে অনিলিখা সেই মুহূর্তেই দেখেছে যে, ডেভ শুধু অংকের প্রফেসার ছিলেন না, একইসঙ্গে নামকরা কেমিস্টও ছিলেন। সে বিষয়ে ওঁর বেশ কিছু রিসার্চ আছে। এমনকী প্রায় কুড়ি বছর আগে

ট্যাবুন ও সারিন—এই দুই অত্যন্ত শক্তিশালী বিষাক্ত গ্যাসের কেমিক্যাল আর ফিজিক্যাল প্রপারটি নিয়েও অনেক কিছু লিখেছেন। টক্সিকোলজি নিয়ে ওঁর অনেক গবেষণা ছিল।

এই দুই অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস নার্ভ এজেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে উনিই কি এসব ঘটনার পিছনে? উনি কি কোনও অত্যন্ত শক্তিশালী নার্ভ এজেন্ট তৈরি করেছেন?

মাইককে ফোন করল অনিলিখা। কিন্তু ফোন ধরল না মাইক।

দশ মিনিট বাদে ফোন এল। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—রিচার্ড ইস অলরেডি ডেড। কেউ আবার অজানা কোনও নার্ভ এজেন্ট প্রয়োগ করেছে। আর সে লোকটা ব্রুনো নয়। ব্রুনো তখনও পৌঁছয়নি। অন্তত এ খুনটা ও করেনি। তবে এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।

—আমার মনে হয় কে করেছে, কে এর পিছনে আছে তা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি।

—কে?

—প্রফেসার ডেভ জেমস। উনি ইচ্ছে করেই আমাদের সামনে এমন কিছু বিষয় তুলে এনেছিলেন যাতে আমরা ব্রুনোকে সন্দেহ করি। নিজেই আড়ালে থেকে কাজ করেছেন।

অনিলিখা এই সন্দেহের পিছনের কারণগুলো বিশদে বলে।

—তুমি কি পাগল হয়েছ! ওঁর তো অনেক বয়স হয়েছে। আশির কাছে। অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নামী প্রফেসার। এই বয়সে কেন করতে যাবেন এসব?

—সে কারণটা আমাকে বুঝতে হবে। উনি নিজে যে করেন তা হয়তো নয়, ওঁর বাড়িতে একটা লোক কাজ করে। আমার নিজের লোকটাকে দেখে একটু অবাক লেগেছিল। চেহারার মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার ছাপ। বিশেষ আলাপ হয়নি। হয়তো তার সাহায্য নেন প্রফেসার। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে হঠাৎ করে কিছু করার দরকার নেই। আমি নিজে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আচ্ছা, তোমাদের ওই ফাউন্টেন পেন একটা লাগবে।

—আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছি তুমি কী করবে।

—আমি কাল সকালেই যেতে চাই। তবে ওই পেনের বাইরে অন্য কোনও সাহায্য এখনই চাই না।

—ঠিক আছে তাই হবে।

২২

আজ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

তারপর দরজা খুললেন স্বয়ং প্রফেসার।

দরজা খুলে এক গাল হেসে বলে উঠলেন,—তোমার কথাই ভাবছিলাম। কবে আবার দেখা পাওয়া যাবে!

অনিলিখাকে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসতে বলে প্রফেসার বলে উঠলেন,—আজ কী খাবে বল? আমাদের এখানে একটা খুব ভালো ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। কীরকম সময় আছে হাতে?

—আজ সময় নিয়ে এসেছি। সন্ধে ছ'টা নাগাদ বেরোব। আমার ঘড়িতে সন্ধে ছ'টা, আপনার ঘড়িতে নয়। —বলে মুচকি হাসল অনিলিখা।

প্রফেসার আনন্দে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন,—সে তো দারুণ ব্যাপার। এমনিতেই গল্প বলার বেশি লোক পাওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ তো আরও স্পেশাল।

—তা আপনার অ্যাসিস্টান্টকে দেখছি না।

—না, ও একটু দরকারি কাজে বেরিয়েছে।

—আমার দিক থেকে একটা ছোট উপহার ছিল।—বলে সঙ্গে আনা পেনটা এগিয়ে দিল অনিলিখা।

—বাহ। এ তো খুব সুন্দর ফাউন্টেন পেন। এখন থেকে বাইরে গেলেই সঙ্গে রাখতে হবে। অনেক ধন্যবাদ।

—তা আমাকে আপনাদের গ্রাম দেখাবেন না? বাড়িতে না বসে থেকে চলুন বাইরে ঘুরে আসি। গ্রাম দেখতে দেখতে কথা বলা যাবে।

—খুব ভালো। আমার তো ঘরে থাকতেই ইচ্ছে করে না। আমার বেশ কয়েকটা সাইকেল আছে। স্ত্রীর সাইকেলটাও আছে। সাইকেল চালানো আসে তো?

অনিলিখা সম্মতি জানাতে ডেভ বলে উঠলেন,—আমি পাঁচ মিনিটে রেডি হয়ে আসছি। তোমাকে নদীর ধারে নিয়ে যাব। ওখানে গিয়ে কথা হবে।

খনিকবাদে ডেভ ও অনিলিখা সাইকেল নিয়ে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ল। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। পাইন গাছে ছাওয়া সরু সরু রাস্তা। দেখেই বোঝা যায় এখানে বসতি গড়ে উঠেছিল কয়েকশো বছর আগে। শহরের মাঝে একটা ভারি সুন্দর পাব। একটা রেস্টুরেন্ট। একটা ১২০০ সালের চার্চ। রাস্তার দু'ধার দিয়ে ভারি সুন্দর দেখতে সব পুরনো দিনের পাথরের কটেজ। ছোট একটা পোস্ট অফিস। তার পাশে একটা ছোট লাইব্রেরি।

লাইব্রেরি দেখিয়ে প্রফেসার বলে উঠলেন,—এটা আমাদের খুব প্রিয় জায়গা। আমরা অনেক বন্ধুরা এখানে প্রতি শনিবারে দেখা করি। সেই সপ্তাহে কে কী বই পড়লাম তা নিয়ে আলোচনা হয়। মজার কথা কী জানো? সেখানেও আমরা এই নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে পাই না।

গ্রামের মাঝখান দিয়ে সরু নদী বয়ে গেছে। তাতে কাচের মতো স্বচ্ছ জল।

সরু উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে ডেভ বলে উঠলেন,—নদী আরেকটু আগে গিয়ে চওড়া হয়েছে। ওখানে যাচ্ছি আমরা।

বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পথ পেরিয়ে ওরা নদীর ধারে পৌঁছল। ডেভ এই বয়সে এখনও এতটাই সুস্থ দেখে অবাক লাগে।

নদীর ধারে একটা জায়গায় সাইকেল রেখে হাঁটতে থাকল দুজনে।

আস্তে আস্তে ডেভ বলে উঠলেন,—আমার খুব রাগ হয় যখন দেখি আকাশটা একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। কখনও উঁচু বাড়ির আড়ালে, কখনও অ্যান্টেনায়, কখনও বা প্লেনের আঁকিবুকিতে। এখন আরও খারাপ লাগে যখন দেখি আমরা কথা বলতেও ভুলে যাচ্ছি। সেদিন একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখি সবার হাতে ফোন। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না।

অনিলিখা বলে উঠল,—সত্যি আমারও মনে হয় আমরা যেন সভ্যতার উলটো পথে হাঁটছি। একটা সময় আমরা কথা বলতে শিখেছিলাম, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বসবাস করতে শুরু করেছিলাম। অন্য জীবের থেকে অনেক ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পেরেছি, তাই সভ্য হয়ে উঠতে পেরেছি। আমরা কি সেই কথা বলতেই ভুলে যাচ্ছি না! সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যাচ্ছি না?

—ঠিক বলেছ। আমরা অজান্তে প্রযুক্তির দাসত্ব স্বীকার করছি!

একটা সময় সবাই ভয় পেত রোবটরা আমাদের পিছনে ফেলে দেবে কিনা এই ভেবে! এখন আর সে ভয় নেই। আমরাই তার আগে অনেক বেশি রোবটদের মতো হয়ে যাব। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ভুলে যাব। নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের কথা ভুলে যাব। আমাদের সংবেদনশীলতা, সহানুভূতি আস্তে আস্তে সব হারিয়ে যাবে।

—আপনার ছেলে কোথায় থাকে প্রফেসার?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন ডেভ। তারপর বলে উঠলেন,—জন, আমার একমাত্র ছেলে, মারা গেছে। এখানে এলেই ওর কথা খুব মনে পড়ে। সেই ওর ছোটবেলার দিনগুলোর কথা। যখন একসঙ্গে বসে আমরা মাছ ধরতাম। ফুটবল খেলতাম। একসঙ্গে পাহাড়ে যেতাম। জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে থাকতাম।

কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে ও একদিন বড় হল। সম্পর্কের সুতো কোথায় যেন আলগা হয়ে গেল। ওকে কাজের জন্য আমেরিকায় চলে যেতে হল। ফোন আসত মাঝে মধ্যে। মাসে একটা। আস্তে আস্তে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। শুনলাম ও নাকি দিনরাত কম্পিউটার নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকে। কী সব নতুন নতুন সফটওয়ার লেখে, বড় একটা কোম্পানিতে কাজ করে। তখন আশির-নব্বইয়ের দশক। কম্পিউটারের শৈশব। অনেক কাজের সুযোগ। ও ওই জগতে আস্তে আস্তে যেন হারিয়ে গেল।

বছরে একবার করে দেখা হতো। পরে তাও হতো না। ফোন করতাম, পেতাম না। সব সময় ব্যস্ত। কম্পিউটার যেন ওকে কেড়ে নিল আমার কাছ থেকে। অথচ ওর কম্পিউটারে হাতেখড়ি আমার কাছেই।

পরে একদিন খবর পেয়েছিলাম ওর চাকরি চলে গেছে। ফোন করেছিলাম কয়েকবার ওর কোনও সাহায্যের দরকার আছে কিনা। ওকে ফোনে পাইনি।

পরে শুনলাম ওর সঙ্গে ওর বউ-এর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

একদিন হঠাৎ ও ফোন করল। ওর ছেলে হ্যারিকে দেখার কেউ নেই। আমরা দেখতে পারব কিনা। বলা বাহুল্য, এতে আর অসুবিধের কী থাকতে পারে! আমরা খুব খুশি।

তখন ওকে বহুবছর বাদে আমরা একবারই দেখেছিলাম। বেশ মোটা হয়ে গেছে। কম্পিউটারে গেমস খেলে সারাক্ষণ। আমাদের এখানে যতদিন ছিল, বেশির ভাগ সময় কম্পিউটার নিয়েই বসে থাকত। সাংঘাতিক ডিপ্রেশানে, একাকীত্বে ভুগছিল। স্বাভাবিক। যে সারাজীবনে নিজের বাইরে কারুর কথা ভাবেনি, সে একটা সময় নিজেকেও সঙ্গে পায় না।

আমার এখানে হ্যারিকে রেখে ফেরত যাওয়ার একমাস পরে খবর পেলাম ও সুইসাইড করেছে। অবশ্য আমার কাছে ওর মৃত্যু আগেই হয়েছিল।—বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন ডেভ। কপালে হাত দিয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ।

—আপনার নাতি হ্যারি এখন কোথায় আছে?

—হ্যারি এখন ইউনিভারসিটিতে পড়ে। তবে আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। ও আমাদের কাছেই বড় হয়েছে। কিন্তু এখনকার যেরকম হয়। এ সমাজটা খুব বিচিত্র। সবাই শুধু নিজেকেই আয়নায় দেখে।

হ্যারির জিনেও বোধহয় সেই প্রযুক্তির নেশা ছিল। আমাদের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও হ্যারিও ওর বাবার মতো আস্তে আস্তে কম্পিউটার অ্যাডিক্ট হয়ে উঠল। হয় কম্পিউটার, না হয় ফোন। এর বাইরে ওর কোনও জগৎ ছিল না। সারাক্ষণ আমাদের বাড়িতে একটা ঘরে বন্দি থাকত। বাইরে যেতে চাইত না। সামনে যারা আছে তাদের সঙ্গে কথা না বলে সোশ্যাল নেটওয়ারকের হাজার মাইল দূরের লোককে আপনার বলে ভাবত।

একবার আমার জন্ডিস হল। একমাস বাড়িতে পড়ে ছিলাম। অবাক ব্যাপার তখনও আমার জন্য ওর কোনও সময় হতো না। সারাদিন পড়ে থাকত নানান ধরনের ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে। ওর ঠাকুমা যেদিন হাসপাতালে ভর্তি হল, সেদিনও হাসপাতালে গিয়ে দেখেছিলাম, যে ও ফোন নিয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছিল ওর সব অনুভূতি ও হারিয়ে ফেলেছে। এমন একটা জগৎ-এর মধ্যে হারিয়ে গেছে যেখানে মানুষ-প্রকৃতি-ভাব-ভালোবাসা-সম্পর্কের কোনও অস্তিত্ব নেই।

হাইস্কুল শেষ হতে ও ইউনিভারসিটিতে গেল। তারপর থেকে আমদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় রাখে না। হয়তো ওই কৃত্রিম জগতের বাইরে কারুর সঙ্গেই ও যোগাযোগ রাখে না।

কিছুদিন আগে শুনেছি, ও এখন ক্লাসও নিয়মিত করে না। নিজের জগতে হারিয়ে থাকে। সেখানে শুধু ও আর ওর কম্পিউটার বা ফোন।

আমি দুঃখিত। হয়তো আমিও এ জগৎকেই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি। আমিও এর জন্য দায়ী।—অনিলিখা আস্তে আস্তে বলে উঠল।

ডেভ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন,—এ কোন জগৎ যেখানে আমরা প্রযুক্তির দাসত্ব এত সহজে স্বীকার করে নিচ্ছি। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো এ কোন বাঁশির সুর যাতে আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের চারদিকের পৃথিবী আর চারপাশের মানুষগুলোকে। ভুলে যাচ্ছি আপনজনকে, ভুলে যাচ্ছি পাশের বাড়ির সেই অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে যে আমাদের কাছে আর কিছু নয়—শুধু সামান্য সময় পাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

চশমা খুলে চোখ মুছলেন ডেভ। ফের বলে উঠলেন,—আমি জন বা হ্যারিকে হঠাৎ করে হারাইনি। হারিয়েছিলাম একটু একটু করে। ওদের আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল প্রযুক্তি। আচ্ছা, আমরা কেন বুঝতে পারছি না যে আমরা আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছি। এ কী সমাজ যেখানে আমরা শুধু নিজের ছোট স্বার্থের কথা ভেবে পরিবেশ ধ্বংস করতেও দ্বিধা করি না। এটাও ভাবি না যে যেভাবে আমরা ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করছি তাতে পৃথিবীর জলবায়ু বদলে যেতে বাধ্য? লক্ষ লক্ষ লোক তার জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে পানীয় জলের খোঁজে যেতে বাধ্য হবে। আমি জানি না। আমি কি করতে পারব। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে অনিলিখা।

অনিলিখা বলে উঠল,—আমরা বলে যাচ্ছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে না, কিন্তু দেখুন এবারে ইউরোপের নানান জায়গায় খরা হচ্ছে। সব ঘাস শুকিয়ে গেছে। এমনকী গরুকে খাওয়ানোর জন্য ঘাস পাওয়া যাচ্ছে না। পর্তুগালে ৪৮ ডিগ্রি, যা গত তিরিশ বছরে হয়নি।

ডেভ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন,—এর মধ্যেও আমরা আমাদের ভুল বোঝাচ্ছি। আমেরিকায় অনেকে সারাদিনের জন্য বাড়ির বাইরে চলে যায় এসি চালিয়ে রেখে। আমাদের কোনও সচেতনতাই নেই। এ পৃথিবীকে আমরা পালটে দিচ্ছি। আমরা গত একশো বছরে পরিবেশের যা ক্ষতি করেছি, তা ভাবলেই খারাপ লাগে। আগে এখানে কত পাখি আসত, কত রঙের প্রজাপতি উড়ত।

হ্যাঁ, তাই অ্যান্ডির মতো অসৎ বিজ্ঞানী যখন মারা যায়, আমার আনন্দ হয়।—অনিলিখা বলে উঠল।

অনিলিখার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ডেভ ফের বলে উঠলেন,—কয়েক বছর বাদে শুধু জলের জন্য দেশে দেশে যুদ্ধ লাগবে। লক্ষ লক্ষ লোক পানীয় জলের সন্ধানে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবে। চারদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এত বেড়ে গেছে। এত জায়গায় ফরেস্টফায়ার লাগছে। এত বেশি সংখ্যায় ঝড় হচ্ছে, তবু আমরা বলছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে না।

একটু থেমে ডেভ ফের বলে উঠলেন,—আমাদের সমস্যা অসৎ বিজ্ঞানীদের নিয়ে। তোমার মতো, বা মিস্টার পাই এর মতো অনেক বিজ্ঞানী আছেন, অনেক প্রযুক্তিবিদ আছেন যারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানবজাতির সামগ্রিক মঙ্গলের কথা ভেবে। নিজের স্বার্থে কিছু করছে না। কিন্তু সে সংখ্যাটা কমে আসছে। বাড়ছে অসৎ বিজ্ঞানীদের সংখ্যা। নিউটন হয়তো ঠিকই বলেছিলেন ২০৬০ সাল নাগাদ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আগেই হতে পারে। তবে তার অনেক আগেই আমরা হয়তো আর মানুষ থাকব না। যন্ত্র হয়ে যাব। আমাদের সঙ্গে তখন যন্ত্রদের একটাই তফাত হবে। যন্ত্ররা নিজেদের কথা ভাববে না। আমরা শুধু নিজেদের কথাই ভাবব।

একটু থেমে ফের বলে উঠলেন প্রফেসার,—সমাজটাও অনেক পাল্টে গেছে। আমাদের গ্রামে অনেক বুড়ো-বুড়ি আছে, যাদের ছেলে বা মেয়ে হয়তো সামান্য দূরে কোথাও আছে। কিন্তু কখনও দেখা করতেও আসে না। তুমিই বলো এ প্রযুক্তির কোনও দাম আছে যেখানে একজন মানুষ তার সবথেকে কাছের মানুষের কাছে হারিয়ে যায়!

—সত্যি তাই। আমাদের সময় আমরা বাইরে গিয়ে খেলাধুলো করতাম, বাড়ির সবার সঙ্গে গিয়ে গল্প করতাম, সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। এখনকার ছেলেমেয়েরা সেখানে ফেসবুকে পড়ে থাকে। যাদের বন্ধু বলে মনে করে তারা কেউ বন্ধুও নয়।

—এখন তো আরও শক্তিশালী কিছু সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আসছে যারা আমাদেরকে ওই কৃত্রিম জগতে বন্দি করার প্ল্যান করছে। চোখের সামনে কী হচ্ছে, কে আছে, তাকে বিশ্বাস না করে আমরা যাকে চিনি না, তার উপরে ভরসা করছি। সবেতে শুধু আমি, আমি, আর আমি। তার বাইরে কোনও কিছুর কথা আমরা ভাবতে ভুলে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। আমাদের গভীর অনুভূতিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সেদিনই একটা জার্নালে দেখছিলাম পরস্পরকে বোঝার ক্ষমতা, অন্যদের প্রতি সহানুভূতি কলেজ স্টুডেন্টদের মধ্যে ৪০ শতাংশ কমে গেছে গত পাঁচ বছরে।

—হ্যাঁ, অন্যের কথা ভাবার জন্য প্রযুক্তি লাগে না, ভাষা লাগে না। সবার আগে মন লাগে। সেটাই যেন হারিয়ে ফেলেছি। কিছু মানুষ এর মধ্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ককে গেমিফিকেশনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চাইছে।

—কেউ কেউ তো আবার নিজেদের স্বার্থে উন্নত মানব গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। ইচ্ছে করে কথাটা উল্লেখ করল অনিলিখা।

আড়চোখে অনিলিখার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন ডেভ,—তুমি তাহলে অনেক কিছুই জেনে গেছ। একটু থেমে ফের বলে উঠলেন,—প্রতি বছরে এখন প্রায় হাজারের মতো জীব জীবজগৎ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাণী অভূতপূর্ব হারে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে আমাদেরই কার্যকলাপ দায়ী। আমরা তা নিয়ে ভাবছি না। ভাবছি না আগামী দিনে যখন বেশ কিছু দেশের বড় অংশ জলের তলায় চলে যাবে, তখন আমাদের কী হবে? আমরা শুধু চোখ বুজে বসে আছি।

একটু থেমে প্রফেসার বলে উঠলেন,—একটা সময় যখন আমার কেউ ছিল না, তখন ওরা সঙ্গে ছিল। পাখির ডাক ছিল। গাছের ছাওয়া ছিল। নীল আকাশ ছিল। যখন খুব অসহায় লাগত, তখনও মনে হতো আমি একা নেই। আজ যেন সব ফের হারাতে বসেছি।

অনিলিখা যখন প্রফেসারের বাড়ি থেকে বেরোল, তখন সাড়ে ছ'টা। হঠাৎ করে মেঘ করে এসেছে। বেরোনোর সময় প্রফেসার অনিলিখাকে আশীর্বাদ করে পেনটা দেখিয়ে বলে উঠলেন,—আই ট্রাস্ট ইউ। গিফটের জন্য এবং আমার মতো বৃদ্ধের সঙ্গে সারাদিন সময় কাটানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা করি, আবার দেখা হবে।

২৩

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। উল্টো দিকে প্রফেসারের গলা।

আজ ছ'টা দশে অল্ডউইচ আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে এসো। এটা কিন্তু চালু স্টেশন নয়। এমন একটা জিনিস দেখাব, যার অস্তিত্ব তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। তোমার জন্যই চিঠিটা পেয়েছি। যার জন্য এ চিঠি লেখা তাকে দিতে যাব। তাই তোমাকে দেখাতে চাই। আমার সঙ্গে তোমার পেনটাও থাকবে। আমাকে

খুঁজে পেতে তোমার অসুবিধে হবে না। হেসে উঠলেন প্রফেসার। ফের বলে উঠলেন,—কাউকে খবর দিও না কিন্তু।

এটুকু বলেই প্রফেসার ফোনটা ছেড়ে দিলেন।

কী করবে অনিলিখা?

এ এক বড় দ্বিধা। জানাবে মাইককে?

অনিলিখার মনে হয়েছে প্রফেসার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তা ঠিক নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ঠিক। এরকম চলতে থাকলে এ সভ্যতার শেষ দিন খুব বেশি দূরে নেই। মানুষ হিসেবেও ডেভ খুব ভালো।

এমনিতেও পেনের মাধ্যমে MI6 নিশ্চয়ই ওঁর যাতায়াত ট্র্যাক করবে।

খানিকক্ষণ দ্বিধার পর অনিলিখা ফোন করল মাইককে এ কথা জানাতে যে, প্রফেসার ছ'টা দশে দেখা করতে বলেছেন। একইসঙ্গে এ ও বলে রাখল যাতে কেউ ওদের পিছু না নেয়।

অনিলিখা জানে এটা বলা সত্ত্বেও MI6 নিশ্চয়ই ওঁকে ফলো করবে। অনিলিখার একার উপরে এ পর্যায়ে ফেলে রাখার মতো এত বড় রিস্ক MI6 নেবে না।

তবে যেটা ওরা জানবে না তা হল, প্রফেসার সময়ের ক্ষেত্রেও ডেসিমাল সিস্টেম ব্যবহার করেন। এরকম অদ্ভুত অভ্যেসের কথা কেউ ভাববে না। তাই ছ'টা দশ মানে যে ছ'টা দশ নয়, এটা ওরা প্রথমে বুঝতে পারবে না। একটা সময় ফ্রেঞ্চরা এরকম সিস্টেম চালু করার কথা ভেবেছিল।

প্রফেসার কার কথা বলছেন? কাকে চিঠি পাঠাবেন? কেনই বা এরকম একটা পরিত্যক্ত জায়গায়? প্রফেসার কি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক? জায়গাটার অনেক দুর্নাম আছে শুনেছে অনিলিখা।

ছ'টা দশ মানে পরিচিত ঘড়ির কাঁটায় সময়টা কত হবে? মনে মনে হিসেব করে নিল অনিলিখা। দশ ঘণ্টায় দিন প্রফেসারের। সেদিক দিয়ে সময় হবে দুপুর দুটো বেজে চল্লিশ মিনিট।

ঠিক দুপুর আড়াইটে নাগাদ ওল্ডউইচ আন্ডার গ্রাউন্ড স্টেশন পৌঁছে গেল অনিলিখা। এটা লন্ডনের উষ্ণতম দিনগুলোর মধ্যে একটা। ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এত গরমে এখানকার লোকেরা অভ্যস্ত নয়। এটা বহুবছর যাবৎ বন্ধ স্টেশন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর মাটির নীচের স্টেশন লন্ডনবাসীদের থাকার জন্য বম্বশেল্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এয়াররেডের সময় অনেক মানুষ এই স্টেশনে আশ্রয় নিত। এখন সে স্টেশনে বছরে শুধু কয়েক দিন টুরিস্টদের যেতে দেওয়া হয়। তবে আগে থেকে বুকিং থাকতে হয়।

কিন্তু কোথা দিয়ে ঢুকবে? একবার পুরো স্টেশনের চারদিক দিয়ে পাক খেয়ে নিল অনিলিখা। স্টেশনের বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢোকার কোনও উপায় নেই। মাঝেমধ্যে ট্র্যাকারে দেখছিল অনিলিখা। এটা ওই পেনের মাধ্যমে প্রফেসার কোথায় আছেন দেখানোর কথা। তাহলে কি প্রফেসার পেন নিয়ে আসেননি?

হঠাৎ অনিলিখা লক্ষ করল ট্র্যাকারে দেখাচ্ছে প্রফেসার স্টেশনের উত্তর দিকে আছেন। সেদিকে খানিকটা যেতে বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা পড়ল। সে রাস্তায় খানিকটা ঢুকলে ডানদিকে একটা খুব পুরোনো দিনের পাব। অনিলিখা দেখল প্রফেসার ওই পাবের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। অনিলিখাকে দেখেই ইঙ্গিত করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। পাব এখন বন্ধ আছে। কিন্তু দরজা ভেজানো।

অনিলিখাও ওঁর পিছন পিছন ঢুকল। প্রফেসার প্রায়ান্ধকার পাবের ভিতরে ঢুকে সোজা আরও ভিতর দিকে হেঁটে চলে গেলেন। পাবের পিছন দিক থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের রাস্তায় ওঠার আগেই একটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। মনে হয় যেন এই পাবের নীচে কোনও টয়লেট আছে, সেখানে যাওয়ার পথ। প্রফেসার ওটা দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। অনিলিখা পিছন পিছন এগোল।

নীচে একটা বন্ধ দরজা পড়ল। প্রফেসার ওই দরজা একটা চাবি দিয়ে খুলে ফেললেন। অনিলিখা পিছু পিছু এগোল। দরজার উলটো দিকে প্রফেসার অপেক্ষা করছিলেন।

প্রফেসার এবারে জামার পকেট থেকে পেনটা বার করে অনিলিখাকে ফেরত দিয়ে হেসে বলে উঠলেন,—আর তোমার আমাকে ট্র্যাক করার দরকার হবে না। এই গুপ্ত দরজাটা খুঁজে বার করতে আমার বহু বছর লেগে গিয়েছিল। এখন আমার এক বন্ধু এই পাবের মালিক।

একটা সময় লন্ডনে অনেক চক পাথরের দরকার হয়েছিল বাড়ি তৈরির জন্য। তখন এই মাটির তলার সুড়ঙ্গগুলো তৈরি হয়। দেখে মনে হবে গোলক ধাঁধা। আস্তে আস্তে অনেক নীচের দিকে চলে গেছে। লন্ডনের নীচে এক আলাদা শহর ছড়িয়ে আছে। জানো কিনা জানি না, ব্রিটিশ লাইব্রেরির সব বই প্রায় মাটির নীচে আটফুট তলা অব্দি রাখা থাকে। সেই বুকশেলফের দৈর্ঘ্য হল চারশো মাইল। এই মাটির তলাতেই পৃথিবীর সবথেকে বড় রূপোর ভল্টও আছে। এখানে একটা নদীও আছে কারকওয়েল। এই নদী ১৮৭০ সাল অব্দি ব্যবহারও করা হতো। লন্ডনের সব নর্দমার ময়লা এসে এ নদীতে মিশত। নদী তাই পণ্য সরবরাহের জন্য অযোগ্য হয়ে উঠছিল। আমি মাটির তলার এই শহরকে উপরের শহর থেকে অনেক ভালো চিনি।

আমার কাছে একটা টর্চ আছে। তুমি এই টর্চটা তোমার কাছে রেখে দাও। কাজে লাগবে।

বলে সামনে টর্চের আলো ফেললেন প্রফেসার।—আমার পিছন পিছন আসবে। এখানে কিন্তু একবার হারিয়ে গেলে খুব সমস্যা। এ টানেল বাইশ মাইল লম্বা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একে চিসলহাস্টের গুহা বলে।

প্রথমবার যখন এসেছিলাম মা'র খোঁজে তিনদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম এই গোলক ধাঁধায়। তারপর একজন বেরোনোর পথ দেখিয়ে দেয়।

—কে দেখায়? এখানে লোক থাকে নাকি?

কিছু বললেন না প্রফেসার—শুধু মৃদু হেসে উঠলেন।

খানিকবাদে যেতে যেতে বলে উঠলেন,—এই জায়গার এতটাই কুখ্যাতি যে চোর ডাকাতরাও এখানে আসে না। একবার দুজন চ্যালেঞ্জ করে ১৯৮৬-তে এখানে একটা অভিযান করেছিল। আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে দুজনে রাত কাটাবে বলে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তাদের মধ্যে একজন রাতে এক মহিলাকে দেখে। কালো লম্বা গাউন পরেছিল। আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছিল। সে দেখে ভয় পেয়ে অন্য জনকে ডাকতে গিয়ে দেখে সে নেই। শুধু তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করে।

পথ হারায়। দশদিন পরে তাকে উদ্ধার করা হয়। সে লোকটা দু-বছর বাদে মারা যায়। কিন্তু সেদিনের সে ঘটনার পরে এ ধরনের ভূত নিয়ে আর কোনও চ্যালেঞ্জের কথা বলেনি।

—তা আপনার সেরকম কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি?

প্রফেসার বলে উঠলেন,—আমার মা এখানে থাকে। তাই সব ভয় কাটিয়ে এখানে বারবার আসতে পেরেছি। কিছু খুব ভয়ের অভিজ্ঞতা অবশ্যই হয়েছে।

আরও মিনিট কুড়ি সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছলেন প্রফেসার। সঙ্গে অনিলিখা। মাটির এত নীচে যে এত বড় জলাশয় থাকতে পারে তা ধারণা করা যায় না।

প্রফেসার বলে উঠলেন,—আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কখন দেখা পাব জানি না। কিন্তু মা ঠিকই আসবে।

ভিতরে কীরকম যেন পচা গন্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চের আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে।

দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করে অনিলিখা থেমে গেল। প্রফেসার কথা বলছিলেন না। যেন অন্য কোনও জগতে হারিয়ে গেছেন।

কতক্ষণ যে এভাবে কেটে গেল কে জানে! অনিলিখার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রফেসার পুরোপুরি স্বাভাবিক তো!

হঠাৎ মনে হল জলের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে কাউকে যেন দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয় খুব লম্বা কোনও মহিলা। টর্চের আলো অতদূর যাচ্ছে না। তাকে ঘিরে যেন একটা কুয়াশা।

প্রফেসার জলের দিকে এগিয়ে গেলেন। অনিলিখা উঠে দাঁড়াল। মনে হল প্রফেসার যেন পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে নিয়ে আরও গভীরজলের দিকে বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন।

অনিলিখা চিৎকার করে উঠল,—প্রফেসার, আর এগোবেন না।

অনিলিখা জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ পিঠে একটা হাত। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পিছনে মাইক। কখন ফলো করেছে বুঝতেও পারেনি। হাতে বন্দুক।

মাইক চিৎকার করে উঠল,—প্রফেসার থেমে যান। আর এক পা এগোলে গুলি করতে বাধ্য হব।

কিন্তু প্রফেসার আরও এগিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে।

দূরে জলের মধ্যে আস্তে আস্তে ওঁর শরীর মিলিয়ে গেল। কুয়াশা যেন আর জমাট বেঁধে ওখানে থেমে থাকল। মাইক গুলি করল না।

২৪

—জানি তুমি দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু নেক্সট টাইমও আমরা তোমার কাছ থেকে একই রকম সাহায্য পাব, আশা রাখি। তোমার মধ্যে সবথেকে বড় ক্ষমতা যা আমাদের কোনও এজেন্টের কাছে নেই, সেটা কী জানো?

—কী?

—অনেকে খুব বুদ্ধিমান হয়। কিন্তু তাদের হৃদয় থাকে না। তোমার সেটা আছে। এজন্যই তোমাকে সবাই খুব সহজে বিশ্বাস করতে পারে। আমি তোমার কথা ভেবেই প্রফেসারকে গুলি করতে পারিনি।

এবারে অনিলিখা MI6-এর মূল বিল্ডিং-এ। 'ভকসহল ব্রিজ'-এর পাশে থেমস নদীর ধারে এই বিল্ডিং। মাইক একা নয়। MI6-এর তরফে আরও পাঁচজন আছেন। আছেন ইউরোপের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর প্রতিনিধি হয়ে আরও চার জন। কোনও একটা অপারেশন শেষের পরে এরকম মিটিং হয়, যেখানে নতুন কী শেখা গেছে, কোন জায়গায় আরও উন্নতির সম্ভাবনা আছে, সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

মাইক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল,—আমাদের পুরো অপারেশনের মধ্যে যদি কোনও একজন থাকেন, যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে, তিনি হলেন অনিলিখা। তিনি কিন্তু একদম সাধারণ একজন নাগরিক। অনিলিখার কথা আমরা অনেকেই জানি। যারা জানেন না, তাদের জন্য অনিলিখার একটা ছোট প্রোফাইল এখানে দেখালাম। মনিটরে অনিলিখার সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল ফুটে উঠল। তাতে প্রযুক্তিবিদ হিসেবে অনিলিখার বিভিন্ন অবদানের কথা লেখা আছে। লেখা আছে অনিলিখার বিভিন্ন রহস্য সমাধানের কথা।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন।

দু-মিনিট বাদে মাইক ফের বলে উঠল,—প্রফেসার মূলত এর পিছনে থাকলেও, এ খুন গুলো করত ওঁর আসিস্ট্যান্ট কেন শিপম্যান। কেন কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট। প্রফেসারের কাছেই পড়েছেন। ওঁর মতাদর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও উগ্রবাদী হয়ে উঠেছিল। প্রফেসারের সঙ্গেই থাকত। আমার ধারণা প্রফেসার এর পিছনের বিস্তারিত প্ল্যানিংটা করতেন। আপনারা তো জানেনই কেন-কে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। ও নিজে এর অনেকটাই স্বীকার করেছে।

এর সঙ্গে ব্রুনোর কোনও যোগাযোগ ছিল না। আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যই প্রফেসার আমাদের সামনে ব্রুনোকে নিয়ে এসেছিলেন। উনি ব্রুনোকে খুব ভালো করে জানতেন। ওঁর খুব প্রিয় ছাত্র ছিল। তাই

এমনভাবে ঘুঁটি সাজাতেন যেন মনে হতো যে ব্রুনোই এর পিছনে আছে। অনিলিখার জন্য আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারি।

একজন প্রশ্ন করে উঠল,—প্রফেসার কেন করতেন সেটা সম্বন্ধে আমরা কি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি?

—অবশ্যই। ওঁর জীবনে ছোটবেলায় কিছু ট্র্যাজেডি হয়। মাত্র সাত বছরে উনি ওঁর বাবা, মা, বোনকে হারান। পরে ওঁর ছেলে আমেরিকায় সুইসাইড করে। ওঁর মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়, যে এর জন্য মানুষ ও প্রযুক্তিই দায়ী। সেখান থেকেই শুরু। ওঁর সঙ্গে প্রকৃতি-পরিবেশের এক অদ্ভুত যোগাযোগ তৈরি হয়। ওঁর পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আমরা পাঁচটা পুতুল উদ্ধার করি।

এটা ভারতের ধর্মভাবনা ও বেদের দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত। আমাদের ধারণা ওই পুতুলগুলো ভারতীয় বেদের পঞ্চভূত—পৃথিবী বা মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ-কে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হয়েছিল। তার সঙ্গে প্রফেসারের কী যোগাযোগ হয়েছিল জানি না। তবে এক কথায় ওঁর মধ্যে ধারণা ছিল, এ পৃথিবী রক্ষার দায়িত্ব ওঁরই।

তাই যখনই ওঁর মনে হতো যে, কেউ তার আবিষ্কার বা প্রয়োগের মাধ্যমে এই পৃথিবী বা মানবসভ্যতার ক্ষতি করতে চলেছে, উনি তখনই তাকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন। উনি শুধু ওঁর বিষয়ে জিনিয়াস ছিলেন না, একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিতে, মেকানিক হিসেবে ওঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাই ওঁর প্ল্যানগুলো এত নিখুঁত হতো যে আমাদের পক্ষেও পাল্লা দেওয়া শক্ত হয়ে উঠেছিল।

যেমন ধরুন সেন্ট জেমস হোটেলে প্রফেসার অ্যান্ডির হত্যা। ওখানে অত সি সি টিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও একটা ক্যামেরাতেও অপরাধী কেন ধরা পড়েনি তা আমরা এখনও জানি না। লেটেস্ট রিপোর্ট সাজেস্ট করছে যে উনি ন্যানো টেকনোলজির চার্জড ন্যানোপারটিকেলের সাহায্য নিয়েছিলেন যার সাহায্যে অপরাধীর মুখচ্ছবি অস্পষ্ট করে দেওয়া যায়। একইসঙ্গে উনি নার্ভ এজেন্ট তৈরি করেছিলেন যা অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তার এফেক্ট যাতে অন্য কারুর মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে, তারও একটা বিশেষ উপায় বার করেছিলেন।

—কিন্তু ওঁর বডি তো এখনও পাওয়া যায়নি।

—হ্যাঁ, ঘটনা যেখানে হয়েছে, সেই বিশেষ জায়গা নিয়ে আমাদের সব রকম তদন্ত চালাতে বিশেষ কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে। আমাদের ডুবুরীরাও ওখানে সার্চ অপারেশন চালাতে চাইছে না। তবে তা সত্ত্বেও অপারেশন চালু আছে। আমরা শিগগিরি ওঁর ডেডবডি খুঁজে পাব বিশ্বাস রাখি।

তা আমি তো একাই বলে যাচ্ছি। আমি এবার অনিলিখাকে কিছু মন্তব্য করতে বলব।

অনিলিখা বলে উঠল,—না, মাইক সবই বলেছে। তবে একটা কথা বলি। প্রফেসার ডেভ যা করেছেন তা আইনের চোখে অবশ্যই অপরাধ, কিন্তু ওঁর জন্য এখন অনেক অসৎ সায়েন্টিস্টের মনে এক ভীতি তৈরি হয়েছে। আগামীদিনে প্রযুক্তির কোনও অন্যায় প্রয়োগ করার আগে তাঁরা একটু হলেও ভাববে। তাই ওঁর মৃত্যু নিয়ে নিশ্চিত না হওয়া একদিক থেকে ভালো।

মাইক সায় দিয়ে ফের বলে উঠল,—এখানে একটা জিনিস যেটা খুব ভালো কাজ করেছে তা হল বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর মধ্যে সমন্বয় ও তথ্যের আদানপ্রদান। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

এর কিছু সময় বাদে মিটিং শেষ হয়ে যায়।

২৫

প্রায় দু-মাস বাদে দেশে ফিরছে অনিলিখা। এবারে বেশ কিছু দিন এ ঘটনার জন্যই আটকে গিয়েছিল।

দুবাই-এ চারঘণ্টার স্টপওভার। তাই ডিউটি ফ্রি-শপগুলোতে ঢুঁ মারছিল অনিলিখা। হঠাৎ মনে হল পাশ দিয়ে যাচ্ছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট জাহির আব্বাস। বেশ কিছু সিকিউরিটি দ্বারা

পরিবেষ্টিত হয়ে লোকটা দ্রুতপায়ে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটা নিউক্লিয়ার টেকনোলজি আফ্রিকার কিছু সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে বলে একটা জোর খবর আছে।

জাহিরের ছবি অনিলিখা বেশ কয়েকবার দেখেছে, তাই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একটু কৌতূহলবশত অনিলিখা দেখল লোকটা ওর দলবল নিয়ে কাতার এয়ারওয়েসের ফ্লাইট ধরার জন্য গেট A11-এর দিকে যাচ্ছে। ওটা মিশর যাচ্ছে।

এত বড় অপরাধী কীরকম বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। নিশ্চয়ই এর মধ্যেই মাল্টি বিলিওনেয়ার হয়ে উঠেছে। পরমাণু বোমা তৈরির ক্ষমতা যদি কিছু টেররিস্ট গ্রুপের কাছে চলে যায়, তাহলে কী যে হতে পারে!

নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অনিলিখার।

নিজের ফ্লাইট ধরারও বেশি সময় বাকি নেই। গেট B21-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অনিলিখা। হঠাৎ মনে হল উল্টো দিক থেকে একজন আসছে যার হাঁটার স্টাইলের সঙ্গে ও খুব পরিচিত।

ইহুদিদের পোশাকে থাকা বৃদ্ধ লোকটা অনিলিখার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুধু হেসে বলে গেল,—ইজিপ্ট যাচ্ছি।

বলে হেসে জাহির আব্বাস যে গেটের দিকে গিয়েছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল।

প্রফেসার ডেভ তাহলে মারা যাননি। ওটা পুরোটাই ছিল M16-এর চোখে ধুলো দেওয়ার একটা উপায়। উনিই বলেছিলেন যে, লন্ডনের তলার শহরটাকে উনি উপরের শহরটার থেকে অনেক বেশি ভালো চেনেন।

